বাংলা

বিজ্ঞান কথা

Vol. II | Issue 12 | Rs. 20

ডিসেম্বর ২০২৪

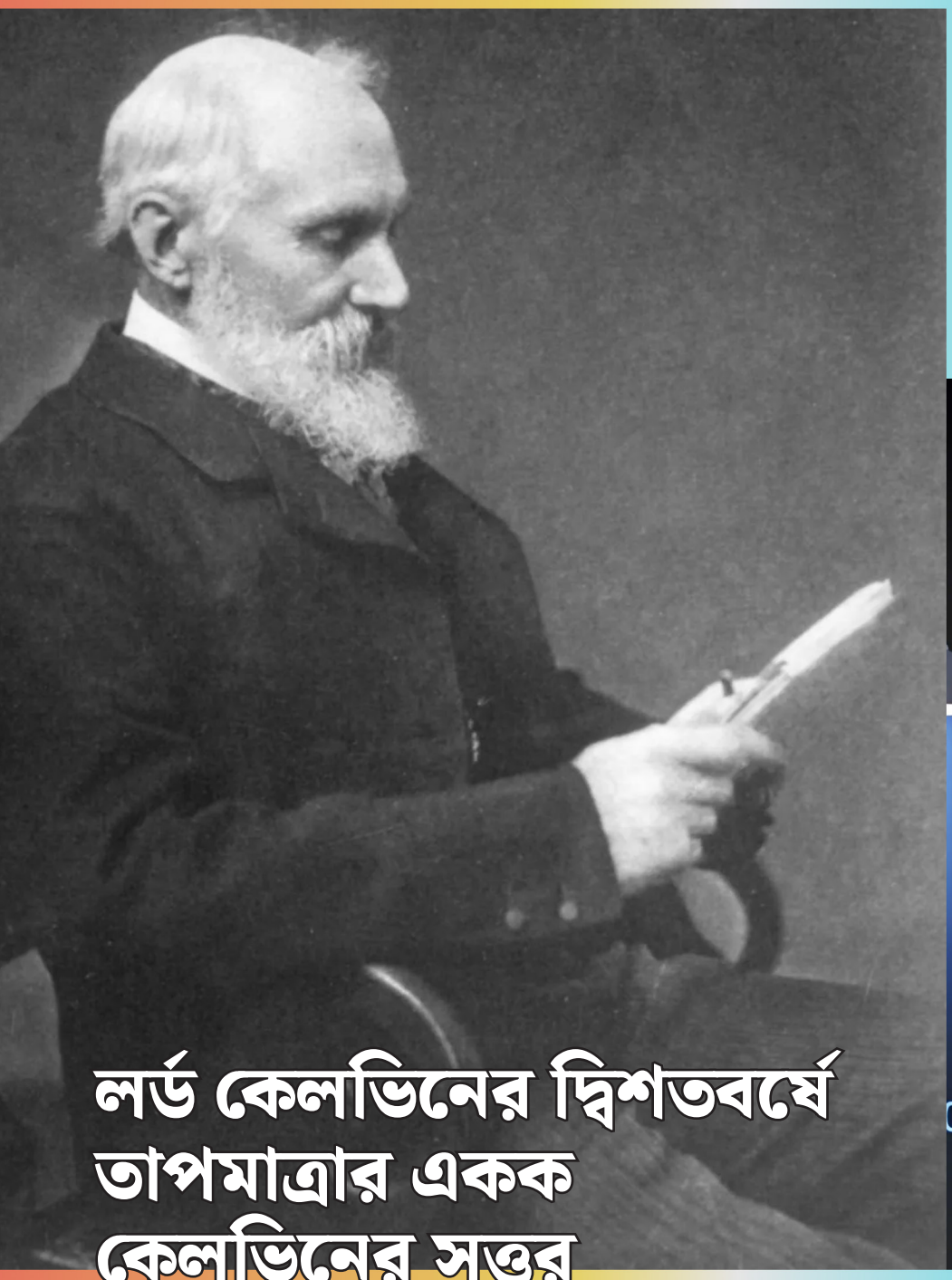

লর্ড কেলভিনের দ্বিশতবর্ষে তাপমাত্রার একক কেলভিনের সত্তর

- চালতার চালচিত্র
- গ্রহ উপগ্রহে প্রস্রবণের বৈচিত্র
- পাটিগণিতের জ্যামিতি
- কয়লা-শক্তির জন্মস্থান চিরতরে কয়লার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল

Shanti Foundation

RAMAKRISHNA MISSION

সূচীপত্র

বিজ্ঞান সংবাদ ৪

লর্ড কেলভিনের দ্বিশতবর্ষে তাপমাত্রার একক কেলভিনের সত্তর ৬
ভূপতি চক্রবর্তী

চালতার চালচিত্র ১৩
দীপাঞ্জন ঘোষ

গ্রহ উপগ্রহে প্রস্রবণের বৈচিত্র ১৬
আবু হানিফ শেখ

পাটিগণিতের জ্যামিতি ১৮
মনোতোষ কুমার মিত্র

কয়লা-শক্তির জন্মস্থান চিরতরে কয়লার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল ২০
মানস রায়

চলে গেলেন অগ্রণী কৃষি-বাস্তুবিদ অধ্যাপক পার্থিব বসু ২৬
অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের ডিসেম্বর মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ২৮

ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা ৩০

গ্রন্থ সমালোচনা
সংখ্যার গল্প ৩২

আর্মস্ট্রং মেডেল জয় করলেন
ডঃ গৌতম চট্টোপাধ্যায়

রেডিও এবং ওয়্যারলেস বিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের জন্য এবছর বিজ্ঞানের জগতে অন্যতম সেরা পুরস্কার ‘আর্মস্ট্রং মেডেল’ পেলেন বাঙালি বিজ্ঞানী ডঃ গৌতম চট্টোপাধ্যায়। গৌতম এই মুহূর্তে নাসায় জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরিজ-এ সিনিয়র সায়েন্টিস্ট হিসেবে কর্মরত। গত 23 নভেম্বর নিউইয়র্কে এক বর্নাঢ্য অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ডঃ রবার্ট উড্রো উইলসন ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা।

প্রসঙ্গত, রেডিও ও ওয়্যারলেস বিজ্ঞান ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কাজে উৎসাহিত করে তুলতে আমেরিকায় 1909 সালে তৈরি হয় ‘রেডিও ক্লাব অফ আমেরিকা’ বা আরসিএ। এই প্রতিষ্ঠান 1935 সালে এই বিশেষ ক্ষেত্রে যে বা যারা দৃষ্টান্তমূলক কাজ করেছেন তাঁদের উৎসাহ দিতে পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আরসিএ-এর তরফে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয় মেজর এডউইন এইচ আর্মস্ট্রংকে। এফএম রেডিও’র জন্য যে সার্কিট দরকার হয় সেই সার্কিট আর্মস্ট্রং আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর নামেই আরসিএ-এর দেওয়া এই পদক বা পুরস্কারের নাম হয় আর্মস্ট্রং মেডেল। পুরস্কার প্রদান মঞ্চে ডঃ গৌতম চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও বক্তব্য পেশ করেন ডঃ রবার্ট উড্রো উইলসন।

প্রসঙ্গত, নাসায় কর্মরত বঙ্গ সন্তান ডঃ গৌতম চট্টোপাধ্যায় ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি’র একজন ভিজিটিং প্রফেসর। এর আগে খড়গপুর ও বেঙ্গালুরু আইআইটিতে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। পেয়েছেন নাসা-জেপিএল 2023 পিপল লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড। নাসা’র একাধিক মিশন যেমন অ্যাস্ট্রোফিজিকস, প্ল্যানেটরি সায়েন্স এবং আর্থ অবজার্ভেশনস-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

বাংলা বিজ্ঞান কথা
December 2024 | Vol. II | Issue 12

সম্পাদকীয়

বিদায় 2024

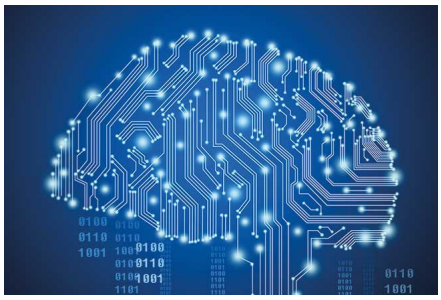

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে ক্রমশ আমরা একটি নতুন বছরের দিকে এগিয়ে চলেছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে দেশের অগ্রগতির ধারাকে অক্ষুন্ন রেখে বিশ্বের পঞ্চম-বৃহত্তর অর্থনীতি হিসেবে তার অবস্থানকে সুসংহত করেছে। মূল অগ্রগতি, যেমন সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে অগ্রগতি এবং মহাকাশ প্রযুক্তি উৎপাদনের সূচনা, স্ব-নির্ভরতা এবং উদ্ভাবনের দিকে দেশের উন্নতিকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে।

বিশ্বব্যাপী, প্রযুক্তি মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে সরাসরি প্রভাবিত করে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। এই সমস্ত অগ্রগতির মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) তার উজ্জ্বল অস্তিত্ব নিয়ে রূপান্তরকারী সম্ভাব্য শিল্প এবং দৈনন্দিন কাজগুলিকে একইভাবে প্রভাবিত করে। উৎপাদনশীলতা বাড়ানো থেকে শুরু করে যোগাযোগের পুনর্নির্মাণ পর্যন্ত, এআই এই বছরের বৈজ্ঞানিক সাফল্যের অগ্রভাগে রয়েছে।

এআই ব্রেইনস্টর্মিং পার্টনার হিসেবে কাজ করার সাথে সৃজনশীলতাও বৃহত্তর রূপ পায়। লেখকরা আকর্ষক গল্পগুলি তৈরি করেন, ছোট ব্যবসাগুলি বাধ্যতামূলক বিপণন ধারণা তৈরি করেন এবং শিল্পীরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অন্বেষণ করেন—সবই AI এর সাহায্যে। এর প্রভাব উপলব্ধির স্তর পর্যন্ত প্রসারিত হয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এমন সরঞ্জামগুলির মাধ্যমে সহায়তা করে যা বক্তৃতা প্রতিলিপি করে, পাঠ্যকে অডিওতে রূপান্তর করে বা আরও ভাল বোঝার জন্য তথ্যকে সহজ করে।

একটি অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ হল ভারতের একজন কৃষক কৃষি উদ্ভাবনের জন্য অর্থায়নের জন্য ইংরেজিতে অনুদানের আবেদনগুলি লিখতে জেনারেটিভ AI ব্যবহার করেছেন৷ ভাষায় সাবলীলতা ছাড়াই, তিনি তার চাষের কৌশল সম্প্রসারিত করার জন্য সম্পদ সুরক্ষিত করার জন্য, খসড়া প্রস্তাব তৈরি করতে ChatGPT ব্যবহার করেছিলেন। এই গল্পটি ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে AI ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন করে, দক্ষতার ফাঁক পূরণ করে এবং সুযোগের দরজা খুলে দেয় যা একসময় নাগালের বাইরে ছিল।

কর্মক্ষেত্রে, জেনারেটিভ এআই পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলিকে সহজ করে, গ্রাহক সমর্থন বাড়ায় এবং উপযোগী সমাধান তৈরি করে, শিল্প জুড়ে উৎপাদনশীলতা উন্নত করে। এটি ভাষা অনুবাদ করে এবং বিভিন্ন শ্রোতাদের জন্য বার্তাগুলি অভিযোজিত করে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগকে উৎসাহিত করে।

সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য, জেনারেটিভ এআই কেবল আধুনিক প্রযুক্তি নয়—এটি একটি সহায়ক, দৈনন্দিন সঙ্গী যা তাদের আরও বেশি অর্জন করতে, বাধা ভাঙতে এবং জীবনের নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়।

কর্মক্ষেত্রে, জেনারেটিভ এআই পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলিকে সহজ করে, গ্রাহক সমর্থন বাড়ায় এবং উপযোগী সমাধান তৈরি করে, শিল্প জুড়ে উৎপাদনশীলতা উন্নত করে। এটি ভাষা অনুবাদ করে এবং বিভিন্ন শ্রোতাদের জন্য বার্তাগুলি অভিযোজিত করে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগকে উৎসাহিত করে।

ChatGPT-এর মতো জেনারেটিভ AI শুধুমাত্র প্রযুক্তি-বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য একটি হাতিয়ার নয়; এটা সবার জন্য। আপনি একজন ছাত্র, পেশাদার বা অবসরপ্রাপ্ত হোন না কেন, এর প্রয়োগগুলি আপনার জীবনকে আরও সহজ, আরও উৎপাদনশীল এবং আরও উপভোগ্য করে তুলতে পারে। এবং যখন আমরা এই উদ্ভাবনগুলিকে আলিঙ্গন করি, আসুন আমরা সেগুলি সম্পর্কে শেখার এবং যোগাযোগের গুরুত্বও গ্রহণ করি। জ্ঞান হল শক্তি—এবং AI এর ক্ষেত্রে, এটি আমাদের সকলের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দ্বার উন্মুক্ত করার শক্তি।

বাংলা বিজ্ঞান কথার সকল পাঠককে জানাই নতুন বছরের অগ্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

ডঃ নকুল পারাশর

উপদেষ্টামণ্ডলী
স্বামী কমলাস্থানন্দ
প্রোঃ বিমল রায়
প্রোঃ অনুপম বসু
ডঃ সুমিত্রা চৌধুরী
ডঃ শুভব্রত রায়চৌধুরী

মুখ্য সম্পাদক
ডঃ নকুল পারাশর

সম্পাদকমণ্ডলী
ডঃ ভূপতি চক্রবর্তী
প্রোঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার
প্রোঃ শঙ্করাশিস মুখার্জি
অমিতেশ ব্যানার্জী

যোগাযোগের ঠিকানা
রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118

শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি 17, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী 110060

ফোন
+91 11 4036 5723

ইমেল
info@shantifoundation.global

ওয়েবসাইট
www.shantifoundation.global

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধ, মতামত বা লেখকের ব্যবহৃত চিত্রের বিষয়ে প্রকাশকের কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না।

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কেবলমাত্র বিনামূল্যে বিতরিত কোনো মুদ্রণ মাধ্যমেই প্রকাশকের অগ্রিম অনুমতির ভিত্তিতে উপযুক্ত সূত্রমূলের উল্লেখসাপেক্ষে পুনর্মুদ্রণযোগ্য।

প্রকাশক
রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118
এবং
শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি ১৭, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী ১১০০৬০

Shanti Foundation

বিজ্ঞান সংবাদ

ঘুমের ব্যাঘাতের কারণ

কেক স্কুল অফ মেডিসিন, ইউএসসি-এর একটি গবেষণায় "স্থায়ী রাসায়নিক" (PFAS) এর রক্তে উপস্থিতি এবং যুবক-বয়সীদের ঘুমের মানের মধ্যে একটি সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে। এটি প্রথম গবেষণা যা এই বয়স গোষ্ঠীর মধ্যে PFAS-এর ঘুমের উপর প্রভাব পরীক্ষা করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, রক্তে চারটি নির্দিষ্ট PFAS কেমিক্যালের অধিক মাত্রার সঙ্গে ঘুমের সমস্যা সম্পর্কিত, যেমন রাতের নিদ্রাহীনতা এবং দিনের বেলায় ক্লান্তি অনুভব করা। গবেষকরা এমন একটি জিনও চিহ্নিত করেছেন যা শরীরের প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং একটি হরমোনের উপর প্রভাব ফেলে যা ঘুম নিয়ন্ত্রণে সহায়ক, যার মাধ্যমে ঘুমের এই ব্যাঘাতের আণবিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। PFAS একটি সিনথেটিক কেমিক্যাল গ্রুপ, যা সময়ের সাথে শরীরে জমা হয় এবং পরিবেশে সহজে ভেঙে যায় না। এগুলি ভোক্তা পণ্য, খাবার এবং পানীয় জলের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। এই কেমিক্যালগুলি বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, যেমন ক্যান্সার, স্নায়বিক রোগ এবং হরমোনের ভারসাম্যহীনতা। তবে, এই গবেষণাটি PFAS-এর ঘুমের উপর প্রভাব প্রথমবারের মতো পরীক্ষা করেছে। গবেষণাটি 19 থেকে 24 বছর বয়সী 144 জন অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে করা হয়েছিল, যারা ইউএসসি চিলড্রেনস হেলথ স্টাডির অংশ ছিলেন। গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন যে PFAS কেমিক্যালগুলির অধিক মাত্রার সঙ্গে ঘুমের মান খারাপ হওয়ার মধ্যে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে। এই গবেষণাটি PFAS-এর জন্য আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানিয়েছে, যাতে ঘুমের গুণমান এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে। ●

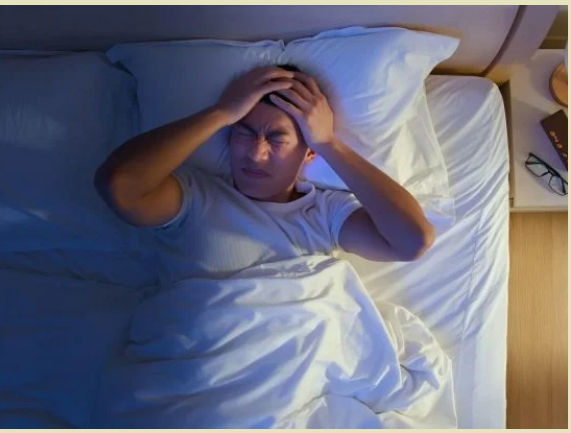

পর্যায় সারণির শেষ কোথায়?

জিএসআই/এফএআইআর এবং জোহানেস গুটেনবার্গ ইউনিভার্সিটি মেইঞ্জের একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা দল সম্প্রতি ফার্মিয়াম (100 তম মৌল) আইসোটোপের উপর ভিত্তি করে ভারী মৌলের উৎপত্তি এবং পারমাণবিক গঠন সম্পর্কে গবেষণার ফল প্রকাশ করেছে। *নেচার* পত্রিকায় প্রকাশিত তাদের এই গবেষণার জন্য বিভিন্ন নিউট্রন সংখ্যার সাথে ফার্মিয়াম আইসোটোপে পারমাণবিক আধান ব্যাসার্ধের বিবর্তনের জন্য উন্নত লেজার স্পেকট্রোস্কোপি কৌশল ব্যবহার করেছে। নিউট্রনের সংখ্যা বৃদ্ধিতে পারমাণবিক আধান ব্যাসার্ধে একটি স্থির বৃদ্ধি দেখায়, যা থেকে বোঝা যায় স্থানীয় পারমাণবিক শেল প্রভাবগুলি এই ভারী নিউক্লিয়াসের ব্যাপ্তি হ্রাস করে। ফার্মিয়ামের মতো মৌল পৃথিবীতে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায় না, অবশ্যই কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত হয়। এই মৌলগুলি প্রাকৃতিকভাবে ঘটতে থাকা মৌল এবং সুপারহেভি মৌলগুলির (104 এর থেকে ভারী মৌলগুলি) মধ্যে সেতু রচনা করে, যা কোয়ান্টাম যান্ত্রিক শেল প্রভাব দ্বারা স্থিতিশীল হয়। এই প্রভাবগুলি ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটনগুলির মধ্যে বিকর্ষণকারী শক্তিকে প্রতিহত করে, যা মৌলগুলিকে স্থায়িত্ব প্রদান করে। পারমাণবিক শেল মডেল অনুসারে, প্রোটন এবং নিউট্রনের "জাদু সংখ্যা" সহ নিউক্লিয়াস বর্ধিত স্থিতিশীলতা প্রদর্শন করে, যেভাবে ভরা ইলেক্ট্রন শেল পরমাণুতে স্থিতিশীলতা প্রদান করে। দলটি 145 থেকে 157 পর্যন্ত নিউট্রন সংখ্যা সহ ফার্মিয়াম আইসোটোপগুলি অধ্যয়ন করেছে। গবেষণায় একটি জাদু সংখ্যা অতিক্রম করার সময় একটি লক্ষণীয় পরিবর্তনের সাথে পারমাণবিক চার্জ ব্যাসার্ধের একটি অবিচ্ছিন্ন বৃদ্ধি লক্ষ্য করা হয়েছে। এটি ভারী পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের গঠন সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রদান করে, বিশেষ করে নিউট্রন সংখ্যা যখন 152-এর কাছাকাছি থাকে, যেখানে শেল প্রভাবগুলি পারমাণবিক বন্ধন শক্তিকে প্রভাবিত করে। পারমাণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে সাথে ম্যাক্রোস্কোপিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাধান্য পায় এবং স্থানীয় শেলের প্রভাবগুলি কম তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই গবেষণাটি অতি ভারী উপাদানগুলির ভবিষ্যত অধ্যয়নের পথ প্রশস্ত করে, স্থিতিশীল প্রক্রিয়াগুলি গভীর ভাবে বুঝতে সাহায্য করে। ●

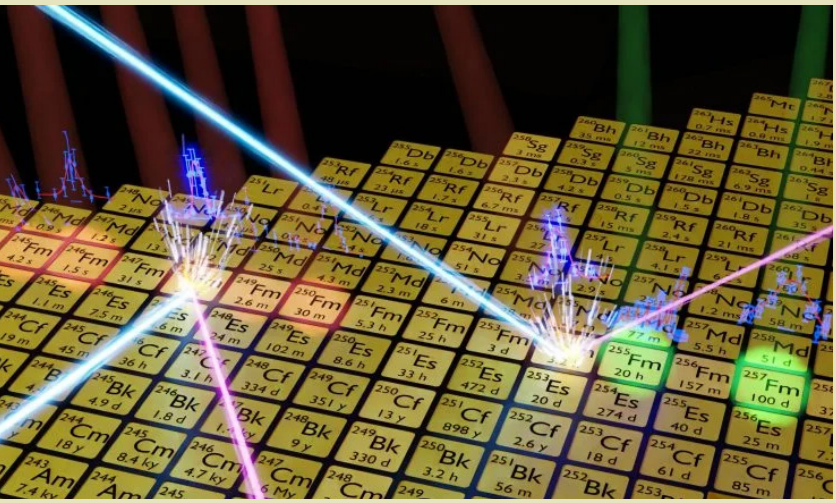

ভূমধ্যসাগরীয় জলস্তর হ্রাসের রহস্য

5.97 থেকে 5.33 মিলিয়ন বছর আগে ঘটে যাওয়া মেসিনিয়ান সালিনিটি সংকট ভূমধ্যসাগরকে একটি বিশাল লবণাক্ত তটভূমিতে পরিণত করেছিল। এই সময়কালে 3 কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর একটি লবণের স্তর সাগরের তলদেশে বিস্তার লাভ করেছিল। এমন বিপুল পরিমাণ লবণ এত কম সময়ে কীভাবে জমা হতে পারে সে নিয়ে বহু বছর ধরে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সংশয় ছিল। সম্প্রতি, ভূমধ্যসাগরের তলদেশের লবণ থেকে ক্লোরিন আইসোটোপের (^{35}Cl এবং ^{37}Cl) বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর উত্তর পাওয়া গেছে, যা প্রমাণ করেছে যে এই প্রক্রিয়াটি দুইটি পর্যায়ে ঘটেছিল। প্রথম পর্যায়ে প্রায় 35,000 বছর ধরে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে প্রধানত লবণ জমা হয়েছিল। এটি ঘটেছিল ভূমধ্যসাগর এবং আটলান্টিকের মধ্যে জল প্রবাহের সীমাবদ্ধতার কারণে, যা সাগরকে ব্রাইনপূর্ণ কিন্তু স্থির রাখে। 10,000 বছরেরও কম সময়ে স্থায়ী দ্বিতীয় পর্যায়ে জমা হওয়া লবণ সমগ্র ভূমধ্যসাগরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই পর্যায়ে একটি দ্রুত, তীব্র বাষ্পীভবন ঘটে যা পূর্ব ভূমধ্যসাগরে 1.7 থেকে 2.1 কিলোমিটার এবং পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে প্রায় 0.85 কিলোমিটার সাগরের স্তরের নাটকীয় পতন ঘটায়। এর ফলে ভূমধ্যসাগরের জলমাত্রার 70% পর্যন্ত শুস্ক হয়ে যায়। এই বিশাল সাগর স্তরের পতন সম্ভবত পৃথিবীর ভূগর্ভের উপরিভাগের উত্তোলন ঘটিয়ে অঞ্চলে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত সৃষ্টি করেছিল এবং সাগরের স্তরের পতনজনিত বৃহত্তর দৃষ্টির কারণে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল। *নেচার কমিউনিকেশনস* পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত এই গবেষণাপত্রটি মেসিনিয়ান সালিনিটি সংকট, এর পরিবেশগত প্রভাব এবং এর বৃহত্তর বিশ্বব্যাপী ফলাফলগুলির উপর নতুন করে আলোকপাত করে, যা চরম ভূতাত্ত্বিক ঘটনাগুলির এবং ভূমধ্যসাগরের অঞ্চলের বিবর্তনের প্রতি আমাদের ধারণাকে স্পষ্ট করে।

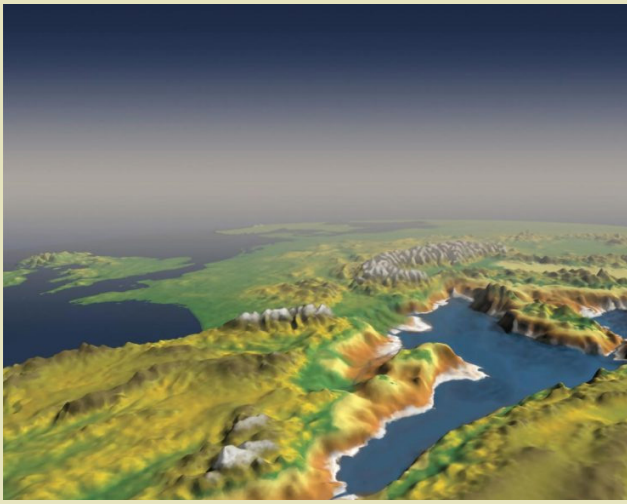

ব্ল্যাক হোল তত্ত্বের বিবর্তন

সম্প্রতি ক্যালটেকের একটি আন্তর্জাতিক অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট গবেষক দল থেকে একটি বৈপ্লবিক আবিষ্কার করেছে, যা একটি প্রাথমিক গ্যাসের যাত্রা থেকে শুরু করে একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের জন্য খাদ্য সরবরাহকারী একটি উপাদানের ডিস্কে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া সিমুলেট করেছে। এই নতুন সিমুলেশনটি অ্যাক্রেশন ডিস্কের উপর বর্তমান তত্ত্বগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে এবং ব্ল্যাক হোল এবং গ্যালাক্সির বৃদ্ধির বিষয়ে নতুন অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। দলটি দুটি বৃহৎ গবেষণা প্রকল্প একত্রিত করেছে: FIRE (Feedback in Realistic Environments), যা বৃহত্তর মহাকাশগত ঘটনাগুলোর তদন্ত করে, এবং STARFORGE, যা ছোট আকারের প্রক্রিয়া যেমন তারার সৃষ্টি ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে। এই দুটি প্রকল্পের মধ্যে সেতু নির্মাণ করতে 1,000 গুণ বেশি রেজোলিউশনের সিমুলেশন প্রয়োজন ছিল। এই গবেষণার ফলাফল *দ্যা ওপেন জার্নাল অফ অস্ট্রোফিজিক্স*-এ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে অ্যাক্রেশন ডিস্কের গঠনে চুম্বকীয় ক্ষেত্রের ভূমিকা আগের ধারণার চেয়ে অনেক বড়। পূর্ববর্তী তত্ত্বগুলির বিপরীতে, যা দাবি করেছিল যে ডিস্কগুলি সমতল হওয়া উচিত, সিমুলেশনটি দেখিয়েছে যে চুম্বকীয় ক্ষেত্রগুলি ডিস্কগুলিকে “ফ্লাফি” অর্থাৎ আঞ্জেল ফুড কেকের মতো করে তোলে। সুপারকম্পিউটিং ব্যবহার করে দলটি একটি ব্ল্যাক হোল সিমুলেট করেছে যার ভর সূর্যের 10 মিলিয়ন গুণ। যখন গ্যাস ব্ল্যাক হোলের দিকে ঘুরে যেতে থাকে এটি একটি অ্যাক্রেশন ডিস্ক গঠন করে। ফলে দেখা যায় যে চুম্বকীয় চাপ তাপীয় চাপের চেয়ে 10,000 গুণ বেশি, যা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ধারণার বিপরীত। এই আবিষ্কারটি ব্ল্যাক হোল এবং তাদের অ্যাক্রেশন ডিস্কের বিষয়ে আরও সঠিক তথ্য প্রদান করে এবং ভবিষ্যত গবেষণার জন্য নতুন পথ খুলে দেয়। এই গবেষণা অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল মডেলগুলিকে নতুনভাবে রূপান্তরিত করতে পারে এবং গ্যালাক্সি মার্জার, তারার গঠন, এবং অন্যান্য মহাকাশগত ঘটনাগুলি সম্পর্কে নতুন অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে।

লর্ড কেলভিনের দ্বিশতবর্ষে তাপমাত্রার একক কেলভিনের সত্তর

ভূপতি চক্রবর্তী

ভূমিকা

কিছু বিজ্ঞানী বা গণিতবিদ কিংবা প্রযুক্তিবিদের নামের সঙ্গে আমাদের সকলের কিছুটা পরিচয় রয়েছে। আর্কিমিডিস, পিথাগোরাস, নিউটন, আইনস্টাইন থেকে শুরু করে রামানুজন, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, জগদীশচন্দ্র বা স্যার সিভি রামনের নাম আমাদের খুবই চেনা। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরও কিছু বিজ্ঞানীর নাম নানা কাজের মধ্যে দিয়ে উচ্চারণ করি বা আমাদের তা করতে হয়, যদিও সর্বদা হয়ত তা খেয়াল করি না। ঘরে লাগানো বিদ্যুতের লাইনে ব্যবহারের জন্য 5 অ্যাম্পিয়ারের প্লাগ খুঁজি, ঘরে লাগানোর জন্য বালবের খোঁজ করতে গিয়ে বালবের ওয়াট কত চাই জানাতে ভুলি না, কিংবা সন্ধ্যাবেলা আবহাওয়ার সংবাদ শুনতে গিয়ে কানে ভেসে আসে সেলসিয়াস সাহেবের নাম।

হ্যাঁ ওয়াট, অ্যাম্পিয়ার, সেলসিয়াস এক অর্থে আমাদের পরিচিত একক তো বটেই তারা আবার বহন করে চলেছে, স্মরণীয় করে রেখেছে কিছু বিজ্ঞানীর নাম কতগুলি এককের মধ্যে দিয়ে। এই তালিকায় রয়েছেন আরও অনেকে। আমাদের রোজকার প্রয়োজনে তাদের সকলের নাম হয়ত উচ্চারিত হয় না, কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তারা সর্বদাই হাজির। তাই বিজ্ঞান গবেষণাগারে চৌহদ্দিতে একবার ঢুকে পড়লে তাপমাত্রার একক হিসেবে চলে আসে কেলভিন। আমাদের চেনা সেলসিয়াসের সঙ্গে তার সম্পর্ক বেশ নিবিড়, কিন্তু তারা ভিন্ন। কারণ, এখন বৈজ্ঞানিক মাপজোকের জন্য যে প্রামাণ্য ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৃহিত হয়েছে সেখানে কেবল এস আই এককের প্রবেশের অধিকার। সেই একক ব্যবস্থায় তাপমাত্রা পরিমাপের এককের দায়িত্বে রয়েছে কেলভিন এবং তা সাতটি মৌলিক এস আই এককের অন্যতম। আর ওই নামের পিছনে থাকা এক বিরাট পদার্থবিদ লর্ড কেলভিনও বিজ্ঞানের ছাত্রদের বিশেষ করে পদার্থবিদ্যার ছাত্রদের কাছে খুবই পরিচিত একটি নাম। উনবিংশ শতকের অর্ধেকেরও বেশি ধরে লর্ড কেলভিন পদার্থবিদ্যার তাত্ত্বিক ও পরীক্ষাভিত্তিক গবেষণায় যে অবদান রেখে গেছেন আজকের আধুনিক পদার্থবিদ্যার তার সুফল ভোগ করছে। এই বছর লর্ড কেলভিনের জন্মের দু'শ বছর পূর্ণ হচ্ছে। সেই সুযোগে আমরা একবার পিছনে ফিরে দেখার চেষ্টা করি তার গবেষণার অবদানকে, আর কিছুটা ওই এককের নামের পেছনে লুকিয়ে থাকা মানুষটিকে।

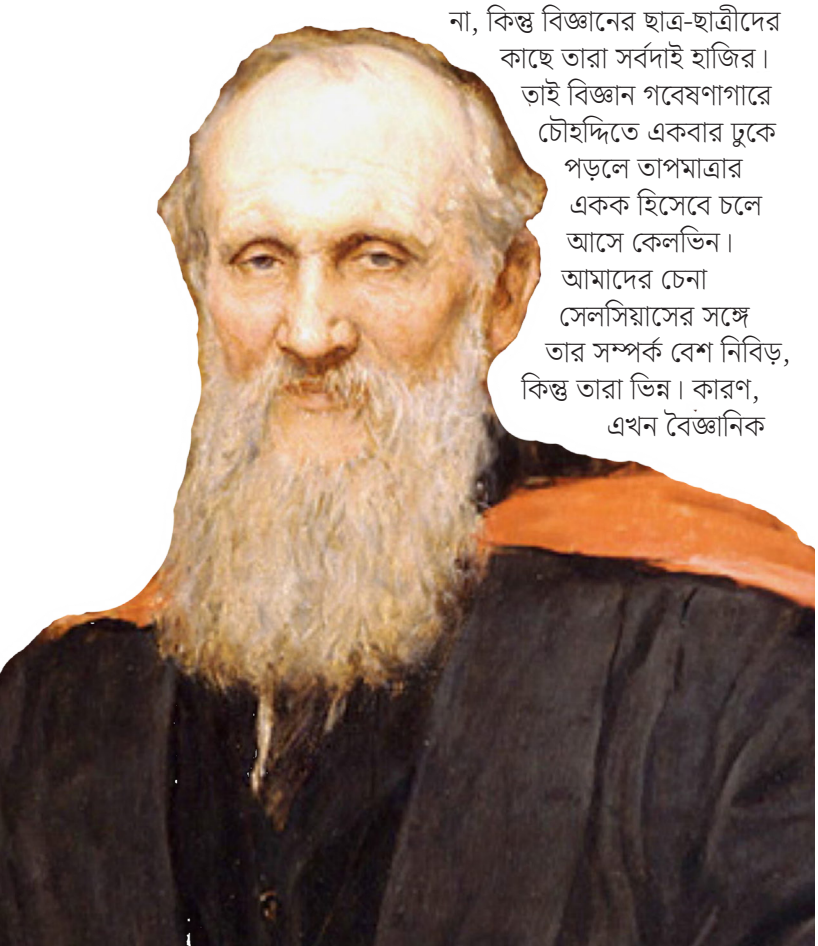

উনবিংশ শতকের প্রথমভাগের ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ

লর্ড কেলভিন পারিবারিক সূত্রে লর্ড ছিলেন না কিন্তু তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে তার বিপুল ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান উইলিয়াম থমসনকে লর্ড কেলভিনে রূপান্তরিত করে দিলো। উইলিয়াম থমসন 1824 সালে স্কটল্যান্ডের বেলফাস্টে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সময়টা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় নিউটনের বিপুল অবদানে সমৃদ্ধ পদার্থবিদ্যায় ও তার গবেষণায় ছিলেন প্রবল আগ্রহী এবং ভৌত বিজ্ঞান বিষয়ে নিউটনের প্রভাবের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল বিজ্ঞানের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি । উইলিয়াম বা তার পরিবার এর বাইরে ছিলেন না। তাই গণিত শিক্ষা তথা বিজ্ঞানের প্রতি তার আগ্রহ গড়ে ওঠে যথেষ্ট ছোট বয়সেই। তার বাবা ছিলেন বেলফাস্টে গণিতের শিক্ষক এবং পরে উইলিয়ামের বয়স যখন নয় বছর তখন তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক হন। উইলিয়াম তার বাবার কাছ থেকে গণিতের প্রাথমিক পাঠ পেয়েছিলেন এবং বিষয়টিতে তার আগ্রহ গড়ে উঠেছিল বেশ ছোটবেলাতেই।

তবে উইলিয়াম ও তার ভাইবোনেদের শিক্ষা সেখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তার পিতার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং তিনি চেয়েছিলেন যে তার সন্তানেরা একটি বহুমুখী শিক্ষা এবং সর্বজনীন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হোক। এর ফলে উইলিয়াম এবং তার ভাই ফ্রান্সে গিয়ে সেখানকার শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হন। এইখানে তিনি ফ্রান্সের তিনজন বিখ্যাত গণিতবিদ

এস আই পদ্ধতির সাতটি মৌল একক। এখানে তাপমাত্রার একক হিসবে রয়েছে কেলভিন (চিহ্ন K)

(ল্যাগ্রাঞ্জ, লেজেন্ডার এবং ল্যাপ্লাস) দের কাজ সম্পর্কে জানতে পারেন। গণিতের জগতে তাদের প্রায়শই তিন বিখ্যাত 'এল' (L) হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়। কিশোর বয়সে তিনি হল্যান্ডেও গিয়েছিলেন। এই অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তাকে বৈজ্ঞানিক কাজে সাহায্য করেছিল এবং মহাদেশীয় ইওরোপের প্রচলিত সংস্কৃতির ও ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এক দারুণ সুযোগ দিয়েছিল। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি তার এই অভিজ্ঞতাকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন।

তাঁর প্রথম দিককার বৈজ্ঞানিক অবদান

কেলভিন লর্ড উপাধিতে ভূষিত হওয়ার আগে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবদানের মধ্যে দিয়ে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছেন, এবং আমরা একাধিক পরিঘটনার সম্পর্কে জানতে পারছি যেখানে অবদান রেখেছেন লর্ড কেলভিন নন; তিনি হচ্ছেন উইলিয়াম থমসন। উদাহরণ হিসেবে, যদি আমরা তাপবিদ্যুতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করি, আমরা তিনটি প্রভাবের কথা বলি যেমন, সিবেক ক্রিয়া, পেল্টিয়ার ক্রিয়া এবং থমসন ক্রিয়া। এই তৃতীয়টি লর্ড কেলভিনের একটি অবদান যখন তিনি তখনও উইলিয়াম থমসন নামে পরিচিত ছিলেন। তাপতড়িতীয় বর্তনী বা থার্মোইলেকট্রিক সার্কিটে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণে, সিবেক সহগ তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং, যদি তাপমাত্রা -দূরত্বের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় বা তার একটি স্থানিক নতি থাকে তাহলে তা দূরত্বের সঙ্গে তাপমাত্রা পরিবর্তিত হবে। এখন যখন একটি তড়িৎ প্রবাহ এই গ্রেডিয়েন্টের বা নতির মধ্য দিয়ে চালিত হয়, অর্থাৎ তখন পেল্টিয়ার প্রভাব কেবল জংশনগুলিতেই পরিলক্ষিত হবে না বরং এটির একটি অবিচ্ছিন্ন বা টানা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে।

এটি থমসন প্রভাব নামে পরিচিত হয়েছিল কারণ তা প্রথম থমসন তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তাব করেন এবং পরে 1851 উইলিয়াম থমসন তা পর্যবেক্ষণ করেন। একই ধরণের একটি গবেষণাফলের হদিশ আমরা পাই জুল-থমসন ক্রিয়ার মধ্যে। যেখানে অবদান ছিল উইলিয়াম থমসন এবং আর এক ব্রিটিশ পদার্থবিদ জেমস প্রেসকট জুলের। সুপরিচিত জুল-থমসন প্রভাবকে এখন জুল-কেলভিন প্রক্রিয়া বা এমনকি কেলভিন-জুল প্রক্রিয়া হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। একটি ছিদ্রযুক্ত প্লাগের মাধ্যমে একটি বাস্তব গ্যাসের তাপরুদ্ধ (adiabatic) সম্প্রসারণে যখন চাপে থাকা গ্যাসটি অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্রযুক্ত পথের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে কেবল আয়তনে বৃদ্ধি পায় না সেখানে একটি শীতলীকরণ প্রক্রিয়াও ঘটে যায়। এটি ছিল উইলিয়াম থমসন এবং তার সহযোগী ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জেমস জুলের অবদান।

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্ত জীবনী

উইলিয়াম থমসনের জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা দরকার। কেলভিন নামটি এসেছে গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীর থেকে, যেখানে উইলিয়াম থমসন 53 বছর ধরে 'প্রাকৃতিক দর্শন' (Natural Philosophy) এর অধ্যাপক ছিলেন। হ্যাঁ, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তখনও লর্ড কেলভিন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন না, এমনকি তিনি ছিলেন না প্রকৌশল বা গণিতের কোনো শাখারও অধ্যাপক। তার বিষয় ছিল প্রাকৃতিক দর্শন। এমনকি যখন বিজ্ঞান বিংশ শতাব্দীর দরজায় কড়া নাড়ছিল, তখনও প্রাকৃতিক পরিঘটনা ব্যাখ্যার জন্য প্রাকৃতিক দর্শনের প্রয়োজন যেন শেষ হয়ে যায় নি। কেলভিন নদী স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরের কাছাকাছি দিয়ে বয়ে চলেছে এবং এই নদীটি মাত্র 35 কিলোমিটার দীর্ঘ। গ্লাসগো শহর ক্লাইড নদীর তীরে অবস্থিত এবং কেলভিন নদী ক্লাইড নদীর একটি উপনদী। 1892 সালে একজন পদার্থবিদ উইলিয়াম থমসনকে কেলভিনের ব্যারন করা হয় যখন তার বয়স প্রায় 68 বছর। অবশ্যই, লর্ড কেলভিনে পরিণত হওয়ার আগে তিনি 1866 সালে নাইটহুডে ভূষিত হওয়ার পরে থেকে তিনি স্যার উইলিয়াম থমসন নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রথম ব্রিটিশ বিজ্ঞানী যিনি হাউস অফ লর্ডসে অন্তর্ভুক্ত হন।

অথচ লর্ড কেলভিন শুধুমাত্র একজন পদার্থবিদ বা বিজ্ঞানীই ছিলেন না কিন্তু একজন প্রকৌশলী, গণিতবিদ ছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন একটা সময়ে যখন মাইকেল ফ্যারাডে তার দুর্দান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন এবং তড়িৎচুম্বকত্বের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করছিলেন। কেন লর্ড কেলভিন তার সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের থেকে অনেকটা ভিন্ন ছিলেন? তার নামের সাথে যুক্ত রয়েছে বিভিন্ন আবিষ্কার, নীতি ও সূত্র। নিউটন ব্যতীত গ্রেট ব্রিটেনের আর কোন পদার্থবিজ্ঞানীর নামানুসারে এত বেশি ধারণা বা কনসেপ্ট, সূত্র, এবং নীতির নামকরণ হয়নি। এর মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় যে পদার্থবিদ্যার নানা শাখায় এবং প্রযুক্তির কিছু ক্ষেত্রে লর্ড কেলভিনের অবদান কী ব্যাপক। কৈশরেই তার চিন্তার মৌলিকতা ধরা পড়ে। অধ্যাপক জয়ন্ত ভি নারলিকারের একটি খুব সুন্দর লেখার মাধ্যমে তরুণ কেলভিনের এক অসাধারণ কাহিনী তুলে ধরেছেন। আবদুস সালাম ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স (ICTP, Triest, Italy) কর্তৃক প্রকাশিত 'One Hundred Reasons to be a Scientist' বইটিতে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কাহিনীটি এখানে সংক্ষেপে বলার প্রয়োজন রয়েছে।

তরুণ উইলিয়াম থমসন, ভবিষ্যতের লর্ড কেলভিন

উইলিয়াম থমসন কেন তার সমসাময়িকদের থেকে ভিন্নঃ একটি কাহিনী

অধ্যাপক নারলিকার এখানে তরুণ উইলিয়াম থমসনের কথা বলেছেন যিনি 1840 এর দশকের গোড়ার দিকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি প্রসিদ্ধ গণিতের ট্রাইপোজ এর মত একটি কঠিন এবং বিখ্যাত পরীক্ষায় বসেছিলেন। থমসন বেশ উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন কিন্তু সকলেই জানতেন যে, তিনি পার্কিনসন নামক আরেক তরুণের সঙ্গে শীর্ষস্থানের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। কারণ পার্কিনসন একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে খুব পরিচিত ছিলেন। একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তরপত্রগুলি মূল্যায়ন করার সময় একজন অধ্যাপক দুজনের উত্তরপত্র নিয়ে কিছুটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেলেন আর এই দুটি উত্তরপত্র ছিল উইলিয়াম থমসন এবং পার্কিনসন এর। প্রফেসর লক্ষ্য করলেন, তিনি খুব চিন্তা করে প্রথাগত প্রশ্নের একেবারে বাইরে এই যে বিশেষ প্রশ্নটি দিয়েছিলেন, কিন্তু দুটি ছাত্রের ক্ষেত্রে তাদের উত্তর নিয়ে কিছু খটকা রয়েছে। বস্তুত কেবল ঐ দু'জন পরীক্ষার্থীই কেবল সেই প্রশ্নের উত্তর লিখতে পেরেছে। আর এই দুই শিক্ষার্থীর উত্তরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিল দেখা যাচ্ছিল। অধ্যাপক জানতেন যে শীর্ষস্থানের প্রতিযোগিতা এই দুই প্রতিযোগীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তিনি সম্ভবত খুব একটা অবাক হননি যে কেবলমাত্র এই দু'জন, পার্কিনসন এবং থমসন এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর লেখার চেষ্টা করতে পারে। যেহেতু তিনি নিজেই এই প্রশ্নটি গবেষণা পত্রিকা থেকে দিয়েছেন তিনি জানতেন এই প্রশ্নের উত্তর কোন বইতে পাওয়া যাবে না। তিনি সেই সময়ে একটি সুপরিচিত গবেষণা জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে আলোচিত একটি সমস্যার ওপর ভিত্তি করে সেই প্রশ্ন করেছিলেন। তাই প্রশ্নটি সেই অর্থে ছিল একেবারে মৌলিক। আর প্রফেসর বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে এই প্রশ্নের উত্তরের

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজ

মধ্যে দিয়ে বোঝা যাবে এই দুই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কে যথার্থই এগিয়ে রয়েছে।

কিন্তু এই দু'জনের উত্তর দেখে অধ্যাপক কিছুটা সমস্যায় পড়ে গেলেন। তাঁর মনে হল যে এই উত্তরগুলির মধ্যে সন্দেহজনক কিছু রয়েছে, হয়ত বা এই দুই ছাত্রের একজন অন্যজনের খাতা দেখে কিছু লিখেছে। তাই, তিনি ঠিক করলেন যে, এই দুই পরীক্ষার্থীর সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু আলাদাভাবে মিলিত হবেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন দু'জনের উত্তরে এত মিল থাকার প্রকৃত কারণটি কী। আসলে ঠিক কী ঘটেছে তা তিনি কিছুটা যেন তদন্ত করে দেখতে চাইলেন।

প্রথমে ডাকা হল পার্কিনসনকে। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে তিনি কীভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন, তিনি বিনীতভাবে জানালেন যে, গবেষণা জার্নাল পড়ার একটা অভ্যাস তার রয়েছে এবং এই বিশেষ সমস্যাটি এইরকম একটি গবেষণা পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে এবং ঐ গবেষণাপত্রে তার সমাধানও রয়েছে। এইভাবে পারকিনসন স্বীকার করলেন যে তিনি উত্তরটি আগে থেকেই জানতেন এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণাপত্র পড়ে তার সংগৃহীত জ্ঞান দিয়ে প্রশ্নটির উত্তর করতে পেরেছেন। অধ্যাপক এই উত্তরে বেশ সন্তুষ্ট হলেন এবং তিনি পার্কিনসনের জ্ঞানের তৃষ্ণার এবং গবেষণা পত্রিকা দেখার অভ্যাসের জন্য অত্যন্ত খুশি হলেন। পার্কিনসন কেবল গবেষণাপত্রটি পড়ে নি; তা অনুধাবন করে মনে রেখে সেই বিষয়ে পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছেন। প্রকৃতপক্ষে, পারকিনসন জার্নাল এবং পেপারটির রেফারেন্স দিতে পারলেন এবং তা অধ্যাপককে একেবারে অভিভূত করে দিল। পার্কিনসনকে তার পিঠে প্রশংসাসূচক চাপড়ানি দিয়ে অধ্যাপক ছেড়ে দিলেন।

এরপর উইলিয়াম থমসনকে প্রফেসর ডেকে পাঠালেন। তাকে সেই বিশেষ প্রশ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল এবং তিনি কীভাবে তার সমাধান করতে পারলেন তা জানতে চাওয়া হল। প্রফেসর উল্লেখ করলেন যে পার্কিনসন একটি গবেষণা পত্রিকায় একটি পেপার দেখেছিলেন যেখানে এই সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছিল এবং এটি তাকে সঠিকভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করেছিল। অধ্যাপক সঙ্গে সঙ্গে যোগ করলেন "আমি আশা করি তুমি আমাকে বলবে না যে তুমিও ওই পেপারটা দেখেছো"। "না স্যার, আমি ওটা দেখিনি" থমসন উত্তর দিলেন এবং তিনি যোগ করলেন "আমি ওই পেপারটি লিখেছি, ওটা আমার গবেষণাকাজ।"

প্রফেসর স্পষ্টতই এই উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না এবং পার্কিনসন পরীক্ষার সর্বোচ্চ স্থান পেলেন এবং থমসন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। প্রকৃতপক্ষে, উইলিয়াম থমসন যখন তার প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন যখন তার বয়স সবেমাত্র 15–16 বছর। এই পেপারটি "PQR" ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি সেই সময়কালে প্রচলিত একটি স্টাইল বা প্রথা ছিল। উইলিয়াম থমসন সত্যিই পেপারটির লেখক ছিলেন কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে থমসন একটি নয় তিন তিনটি পেপার ওই "PQR" ছদ্মনামে লিখেছিলেন এবং তা প্রকাশিত হয় দ্য কেমব্রিজ ম্যাথামেটিক্যাল জার্নাল এ। এই পেপার লিখতে তাকে উৎসাহিত করেছিলেন তার বাবা এবং তিনি পেপারটি জার্নালে পাঠিয়েছিলেন। অধ্যাপক নারলিকার উল্লেখ করেছেন যে মূল্যায়নকারী হিসাবে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক কিন্তু একটি গবেষণাপত্রের লেখক হিসাবে থমসনের মৌলিকত্বকে স্বীকৃতি দেননি বা সেইরকমভাবে বুঝে উঠতে পারেন নি। পার্কিনসনের ওপর তার মনোযোগ বেশি ছিল কারণ পার্কিনসন দক্ষতার সাথে গবেষণাপত্রের থেকে উপকরণ সংগ্রহ করতে পারেন। এই প্রক্রিয়ায় পার্কিনসন পরীক্ষায় প্রথম হয়ে এবং পুরস্কার জয় করেছিলেন কিন্তু থমসন আধুনিক ভৌত বিজ্ঞানের এক মহীরুহ হিসেবে রয়ে গেছেন। পার্কিনসন কখনই বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর অংশ হয়ে উঠতে পারেনি বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে পারে নি। জ্ঞানচর্চার যে কোন শাখায় মৌলিকত্বের একটি বিশিষ্ট জায়গা রয়েছে।

লর্ড কেলভিন ও সূক্ষ্মতর পরিমাপ

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানচর্চার ধারা অনুসরণ করে লর্ড কেলভিন অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিমাপের সাথে জড়িত বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। সেই সময়ে উচ্চতর মাত্রার সূক্ষ্মতার সঙ্গে বিভিন্ন ভৌত পরিমাপ এবং ভৌত ধ্রুবক নির্ধারণের কাজ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। এই প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানীরা প্রত্যাশিত মান থেকে বিচ্যুতি খুঁজতেন এবং এই

লর্ড কেলভিন, লেডি কেলভিন (ছবিতে সবথেকে ডান দিকে) এবং তাদের অতিথি দম্পতি

ফলাফলের পেছনের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেন। এই ধরনের কাজের প্রতি কেলভিনের দৃঢ় প্রত্যয় তার খুব পরিচিত উক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি উনিশ শতকের শেষের দিকে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স দ্বারা আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক কর্মীদের এক সমাবেশের আগে বলেছিলেন। "যখন আপনি যে বিষয়ে কথা বলছেন তা পরিমাপ করতে পারেন, এবং সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারেন, আপনি এটি সম্পর্কে কিছু জানেন, যখন আপনি সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারবেন না, তখন আপনার জ্ঞান কিন্তু সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছয় নি। এটি জ্ঞানের শুরু হতে পারে, কিন্তু আপনার চিন্তাধারার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানের পথে আপনার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় নি।"

সঠিক পরিমাপের জন্য তার আগ্রহ আধুনিক সময়ে বিজ্ঞানীদের দ্বারা কেবল প্রশংসিত হয়নি বরং অনেককে বিস্মিতও করেছে। 1871 সালে লর্ড কেলভিন একটি সমীকরণ তৈরি করেছিলেন যা এখন কেলভিন সমীকরণ নামে পরিচিত যা আমাদের একটি তরল-বাষ্পের বক্র বিভেদতলে বাষ্প চাপের পরিবর্তন দেয়। উদাহরণ হিসেবে একটি তরল বিন্দুর কথা ভাবা যেতে পারে। 2020 সালে গবেষকরা খুব সতর্কতার সাথে অত্যন্ত উন্নত ও সুবেদী যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করে আবিষ্কার করেছেন যে সমীকরণটি এমনকি 1 ন্যানোমিটার স্কেলেও সঠিক ফলাফল প্রদান করে!

1874 সালে তিনি যখন খ্যাতির চূড়ায় তখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় আধুনিক বিজ্ঞানের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগার ক্যাভেনডিশ ল্যাবরেটরি। ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরি 2024 এ দেড়শ বছর পূর্ণ করলো। সমগ্র বিংশ শতাব্দী ধরে এই গবেষণাগার বিশ্বের প্রথম সারির গবেষকদের কাছে পরীক্ষাভিত্তিক পদার্থবিদ্যা তথা বিজ্ঞানের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 1874 সালে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কেলভিনকে এই গবেষণাগারের প্রধান হিসেবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের মতে সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে তিনিই ছিলেন এই কাজের যোগ্যতম ব্যাক্তি। কিন্তু লর্ড কেলভিন গ্লাসগো ছেড়ে কেমব্রিজে গিয়ে এই দায়িত্বভার গ্রহণে রাজি হলেন না। সেই দায়িত্ব দেওয়া হল আর এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী তেতাল্লিশ বছর বয়সী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলকে। সামগ্রিক বিজ্ঞানে ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরির অবদানের কথা মনে রেখে অনেকেই অনুমান করার চেষ্টা করেন যে লর্ড কেলভিন ওই দায়িত্ব নিতে সম্মত হলে কেমন হত।

কেলভিন তাপমাত্রার সূক্ষ্মতর পরিমাপে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং তিনি গ্যাস সূত্রের ওপরে ভিত্তি করে "শীতলতম তাপমাত্রার" সন্ধান শুরু করেন। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি একটি পেপারে দেখান যে এই শীতলতম তাপমাত্রা হবে –273 ডিগ্রী সেলসিয়াস বা আমাদের পরিচিত 0 ডিগ্রী সেলসিয়াস

থেকে সেলসিয়াস স্কেলে 273 ধাপ নিচের এক তাপমাত্রা। এর ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তাপমাতারর চরম স্কেল যেখানে প্রতিটি ধাপ হচ্ছে এক ডিগ্রী সেলসিয়াসের সমান। পরিমাপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা শেষ পর্যন্ত 1954 সালে এই স্কেলটিকে বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরিমাপের ক্ষেত্রে একমাত্র স্কেল হিসেবে গ্রহণ করে। কেলভিন স্কেলের তাপমাত্রা প্রকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একমাত্র তাপমাত্রার একক হিসেবে স্বীকৃত হয়। এস আই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত সাতটি মৌলিক এককের মধ্যে তাপমাত্রার একক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে কেলভিন, সেই 1954 সালে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে চরম তাপমাত্রার ধারণা এবং তার প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে কেলভিনের সার্বিক অবদান এবং সম্ভবত সূক্ষ্মতর পরিমাপে তার আগ্রহের কারণে এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল। কেলভিন গত সত্তর বছর ধরে এই দায়িত্ব পালন করছে। তাই আজকের তাপমাত্রা আমাদের টেলিভিশানে 30 ডিগ্রী সেলসিয়াস বলে উল্লেখ করলেও বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণাপত্রে তা হয়ে যায় 303 কেলভিন বা 303 K। না, কেলভিন লিখলে আর ডিগ্রী লিখতে হয় না।

উনবিংশ শতকের শেষের কেলভিন

যাইহোক, বিজ্ঞানের বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি অর্থাৎ আরও সঠিক পরিমাপের প্রতি তার দৃঢ় প্রত্যয় তাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ঘোষণা করতে কিছুটা প্ররোচিত করেছিল যে, “পদার্থবিজ্ঞানে এখন নতুন কিছু আবিষ্কার করার নেই। পদার্থবিদ্যায় এখন কেবল সূক্ষ্মতর পরিমাপের কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং আরও ভাল করে অধ্যয়ন করতে হবে আবিষ্কৃত পরিঘটনাগুলি”। আমাদের মনে রাখা দরকার যে এটি এমন একটি সময়ে বলা হয়েছিল যখন একদিকে পরমাণুর কেন্দ্রকের পরিঘটনা তেজস্ক্রিয়তার এবং অন্যদিকে পরমাণুর থেকে ছোট এবং তার গঠনের কাজে ব্যবহৃত প্রথম মৌলিক কণিকা ইলেকট্রন আবিষ্কৃত হচ্ছে। প্রায় একই সময়ে এক্স-রে আবিষ্কৃত হয়েছিলার তার বছর তিনেক বাদে আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রস্তাব করা হয়েছিল। অ্যানাস মিরাবিলিস অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জীবনে 1905 সালে এসে উপস্থিত হয়েছিল। আইনস্টাইন কয়েকটি যুগান্তকারী পেপার প্রকাশ করেছিলেন, ফটোইলেকট্রিক প্রভাব ব্যাখ্যা করেছিলেন, আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বকে সামনে রেখেছিলেন এবং আমাদের ভর শক্তির সমতা দেওয়ার সমীকরণ নিয়ে এসেছিলেন। ততদিনে লর্ড কেলভিন আশির কোঠায় প্রবেশ করেছেন।

আলফ্রেড নোবেলের উইলের উপর ভিত্তি করে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তিত হয়েছিল। আলফ্রেড নোবেল তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে 1895 সালে এই উইলটি করেছিলেন এবং 1901 সালে প্রথম নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল। উইলের শর্তে বলা হয়েছিল যে পুরস্কারগুলি শুধুমাত্র জীবিত ব্যক্তিদেরই

দেওয়া হবে যেখানে মরণোত্তর পুরস্কারের কোনও বিধান নেই। এটি একটি বহুল আলোচিত বিষয় কেন যে দুজন, অসাধারণ বিজ্ঞানী, যাদের একজনের রসায়নের অবদান এবং অপরজনের পদার্থবিদ্যার অবদান আজও ছাত্রেরা পাঠ করে চলেছে এই পুরস্কার থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলেন। এই দু’জনই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ছিলেন যথেষ্ট বরিষ্ঠ এবং তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছিলেন, কিন্তু নোবেল পুরস্কার তাদের দেওয়া হয়নি। দুজনেই পুরস্কারের জন্য কয়েকটি মনোনয়ন পেয়েছেন তবু পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায় তাদের নাম ওঠেনি। সংশ্লিষ্ট দুই বিজ্ঞানী হলেন রাশিয়ার দিমিত্রি মেন্ডেলিভ (1834–1907) এবং গ্রেট ব্রিটেনের লর্ড কেলভিন (1824 –1907)। এই দুই বিজ্ঞানীই 1907 সালের রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যার পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছিলেন এবং সেই বছরই তারা প্রয়াত হন। মজার বিষয় হল, কেলভিনকে 1901 সালের পদার্থবিজ্ঞান পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছিলেন উইলহেম রন্টজেন যিনি প্রথম পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার জয় করেছিলেন।

লর্ড কেলভিন নোবেল পুরস্কারের প্রাথমিক বছরগুলিতে মনোনয়নকারী হিসাবেও কাজ করেছিলেন। তিনি 1902 সালে ব্রিটিশ পদার্থবিদ জন কেরের (John Kerr) পক্ষে তার প্রথম মনোনয়ন পাঠান। কের ছিলেন লর্ড কেলভিনের বয়সের সমান এবং গ্লাসগোর বাসিন্দা। তিনি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ক্ষেত্রগুলিতে রাখা কঠিন এবং তরলের মধ্যে দ্বি-প্রতিসরণ আবিষ্কার করেছিলেন এবং

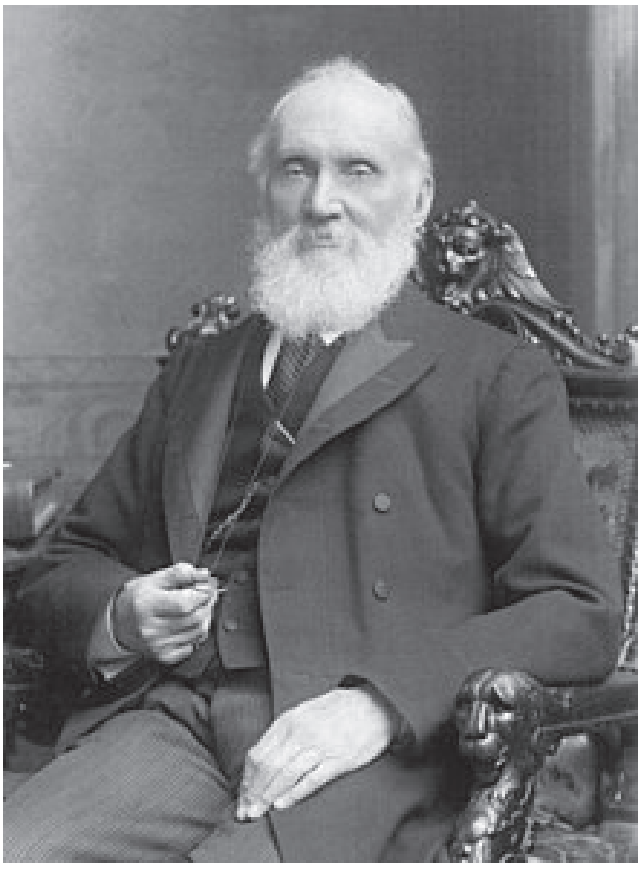

পরিণত বয়সে লর্ড কেলভিন

ঘটনাটি কের ক্রিয়া হিসাবে পরিচিত হয়েছিল। একই বিজ্ঞানী 1903 সালেও কেলভিনের কাছ থেকে মনোনয়ন পেয়েছিলেন। কের অবশ্য কখনও নোবেল পুরস্কার পাননি। কেলভিন 1904 সালে একজন মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে সফল হন যখন লর্ড র‍্যালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের কেউ কেউ মনে করেন যে লর্ড কেলভিন নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান ছিলেন এবং তিনি যে আর একজন নোবেল বিজয়ী হননি তা সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এবং বিশেষ করে পদার্থবিদ্যায় তার বিশেষ অবস্থানকে চিহ্নিত করেছে। তবুও আরেকটি অংশ মনে করে যে নোবেল পুরস্কারটি আরও গৌরবময় হতো যদি পুরস্কারটি লর্ড কেলভিন এবং দিমিত্রি মেন্ডেলিভকে দেওয়া হতো। লর্ড কেলভিন স্যার জে জে থমসনের পক্ষে 1905 সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেলের জন্য তার শেষ মনোনয়ন পাঠান। থমসন পরের বছর অর্থাৎ 1906 সালে পুরস্কার জয় করেন।

সমাপ্তিপর্বের মন্তব্য

লর্ড কেলভিন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভিক্টোরিয়ান যুগের একজন স্কটিশ বিজ্ঞানী ছিলেন তা তার কিছু বক্তব্য থেকেও স্পষ্ট হয় এবং আজকে তা কিছুটা আশ্চর্যজনক মনে হয়। তিনি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞানের সর্বব্যাপী ভূমিকাকে তুলে ধরতে একই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ঘোষণা করতে পারেন যে, প্রাণিবিদ্যা বা উদ্ভিদবিদ্যার মতো বিষয়গুলির বিশেষ গুরুত্ব নেই। তার মতে, "বিজ্ঞানে সবকিছুই পদার্থবিদ্যা এবং বাকি যা কিছু তা হচ্ছে স্ট্যাম্প সংগ্রহ" কারণ সেই সময় প্রাণীজগতের বা উদ্ভিদ জগতের পর্যালোচনায় শ্রেণীবিভাগের উপর ছিল বিশেষ জোর। তিনি ছিলেন এক আদ্যন্ত পদার্থবিদ। লর্ড কেলভিন 1890 সালে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি হন, এই পদে তিনি 1895 সাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পদার্থবিজ্ঞানের ভবিষ্যত সম্পর্কে লর্ড কেলভিন বিংশ শতকের গোড়াতে যে ভাবনা প্রকাশ করেছিলেন, আমরা জানি তা একেবারেই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানে যে বিপ্লব ঘটতে চলেছে তা তিনি ধারণা করতে পারেননি যদিও তার জীবনের শেষ কয়েক বছরে এই বিষয়ে ইঙ্গিত ফুটে ওঠা শুরু হয়েছিল। মনে হয় তিনি সম্ভবত উনিশ শতকের ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যা থেকে পদার্থবিদ্যার ভিন্ন পথে যাত্রার ইঙ্গিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেননি। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তিনি আর একটি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, বলেছিলেন "বায়ুর থেকে বেশি ভারী উড়ন্ত মেশিনের উদ্ভাবনা অসম্ভব।" এটি এমন এক সময়ে বলা হয়েছিল যখন রাইট ভাইরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লর্ড কেলভিন জীবিত থাকাকালীন কয়েক মাইল উড়তে পারে এমন বিমানের প্রাথমিক সংস্করণ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজ থেকে এক'শ সতেরো বছর আগে 1907 সালের ডিসেম্বর মাসে প্রয়াত হন লর্ড কেলভিন। একবিংশ শতাব্দীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি রসায়ন, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার বিজ্ঞান বা জীববিদ্যার সাথে পদার্থবিদ্যা এবং গণিতের একীভূতকরণ এবং আরও অনেক কিছু আধুনিক জীবন-বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্র করে তুলেছে।

সাহায্যসূত্র

1. *One Hundred Reasons to be a Scientist Published from The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP, Trieste, Italy 2004)*
2. *Different entries from Wikipedia*
3. *Scottish Science Hall of Fame https://digital.nls.uk/scientists/biographies/lord-kelvin/*

লেখক ***ড. ভূপতি চক্রবর্তী*** *কলকাতার সিটি কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং তিনি 2013 থেকে 2018 সাল পর্যন্ত IAPT-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ইমেল: chakrabhu@gmail.com*

চালতার চালচিত্র

দীপাঞ্জন ঘোষ

প্রকৃতিপ্রেমিক কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর হতাশা চেপে রাখতে পারেন নি; লিখেছিলেন—

‘আমি চলে যাব ব’লে
চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে’?

কবি খানিক অসময়ে চলে গেছেন। তবে তাঁর প্রিয় চালতা ফুল ফুটছে সময়মতই। কবি দেখতে যে পারবেন না, যেন আগে থেকেই জানতেন! কবিতায় সেই কষ্টকর বিচ্ছিন্নতার কথা জীবদ্দশায় আগাম লিখে রেখে গিয়েছিলেন। একইরকমভাবে, কোন বর্ষার দিনে চালতা ফুলের রূপমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে কবি বিষ্ণু দে লিখেছিলেন,

‘আকাশ নীলের
তারাখচা পথে বৃষ্টি পড়ে
চালতা ফুলে ফলের
বাগান মদির করে’।

না, শুধু কবিদের নয়, সৌন্দর্য্যপ্রেমীদের এই ফুল বহুকাল ধরে মুগ্ধ করে রেখেছে। সবুজ পাতার আড়ালে মুখ লুকোনো অনিন্দ্য সুন্দর ফুল চালতা বাকি সব ফুলের থেকে আলাদা। ফুলটি সুন্দর, গাছটিও। অথচ সাধারণ মানুষের কাছে ফুল, ফল বা গাছ কোনটিরই তেমন কদর নেই! বড় অবহেলায় বেড়ে ওঠে আমাদের এই দেশজ গাছটি। চালতার আদি নিবাস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ আরও কিছু দেশে গাছটি স্বাভাবিকভাবে জন্মায়। অনেক সময় ফলের আশায় বাগানেও রোপন করা হয়। একসময় গ্রামে-গঞ্জে চালতা গাছ সহজেই চোখে পড়ত। গৃহস্থ বাড়ির পেছনের ঝোঁপ-জঙ্গলের আড়াল থেকে উঁকি দিত চালতা। তবে অতি চেনা এই চালতা গাছের সংখ্যা দিন দিন যেন কমে আসছে!

চালতা (*Dillenia indica*) গাছ ডিলেনিয়াসি (Dilleniaceae) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। বিখ্যাত সুইডিশ বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস স্বয়ং এই গাছটির নামকরণ করেন। গাছটির গণ নাম ‘*Dillenia*’ রাখা হয় লিনিয়াসের বন্ধুস্থানীয় জার্মান বিজ্ঞানী এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিখ্যাত অধ্যাপক জোহান জ্যাকব ডিলেনিয়াসের (1684–1747) নামে। প্রজাতি নাম ‘*indica*’ নির্দেশ করে গাছটির উৎপত্তি ঘটেছিল ভারত ভূখণ্ডে। ইংরিজিতে চালতাকে ‘Elephant Apple’ বলা হয়। এমন নামকরণের কারণ সম্ভবত হাতিদের অতি প্রিয় ফল এই চালতা। এমনও জানা গেছে যে, ফলের দখল নিয়ে প্রায় সময়ই হাতি আর মানুষের লড়াই হয়। গাছটিকে ‘Indian Catmon’ নামেও চেনেন অনেকে। ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করায় চালতার অনেক আঞ্চলিক নাম রয়েছে। চালতার সংস্কৃত নাম ‘ভব্য’। বাংলা এবং আসামে এটিকে ‘চালতা’ বা ‘চালিতা’ বলা হয়। হিন্দিতে বলে ‘চলতা’। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে ‘ক্যারাম্বেল’, কর্ণাটকে ‘কালটেগা’, অন্ধ্রে ও তেলেঙ্গানায় ‘পেড্ডা কালিঙ্গা’ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে চালতা পরিচিতি লাভ করেছে। প্রতিবেশী দেশ নেপালে চালতাকে ‘রামফল’ বলে।

চালতা মাঝারি আকৃতির চিরহরিৎ বৃক্ষ। সর্বোচ্চ উচ্চতা প্রায় 6–7 মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। শাখা-প্রশাখা এলোমেলো। বাকল লালচে মসৃণ। গাছের আয়ু মোটামুটি 25 থেকে 30 বছর। অনাদারে বড় হয় চালতা গাছ। এই গাছ সচরাচর কেউ চাষ করে না। ফল পেকে গিয়ে মাটিতে পড়ে। ফলের মধ্যে থাকা বীজ থেকেই নতুন চারাগাছের জন্ম হয়। চালতা গাছের পাতাগুলি সরল প্রকৃতির, সবৃন্তক, ভল্লাকার, 15–36 সেন্টিমিটার লম্বা; পাতার পৃষ্ঠতল সুস্পষ্টভাবে ঢেউ খেলানো, অনেকটা পটেটো চিপসের মত; কিনারা খাঁজকাটা, করাতের দাঁতের মত দেখতে, যদিও ধারালো নয়। মনে হয়, কেউ কাঁচি চালিয়ে চমৎকার নক্সা করে দিয়েছে। পাতার শিরাগুলি নিমজ্জিত (Impressed) এবং প্রায় 30–40 টি শিরা পরস্পর সমান্তরালে বিন্যস্ত।

বছরের মে থেকে জুন মাসের মধ্যে চালতার ফুল (চিত্র 1) ফোটে। দৃষ্টিনন্দন সুগন্ধি ফুল কয়েকটি পর্যায়ে নিজেকে বিকশিত করে। ক্রমে বাড়তে থাকে সৌন্দর্য। এক-একটি গোলাকার চালতা ফুলের ব্যাস প্রায় 15–18 সেন্টিমিটার।

চিত্র 1: চালতা ফুলের সৌন্দর্য মনকে আনন্দ দেয় (ফটো: দেবাংশু মুখার্জি)।

চিত্র 2: চালতা ফল পাকতে শুরু করেছে (ফটো: লেখক)।

ফুলের স্তবকগুলি সমকেন্দ্রিক বৃত্তের আকারে সাজানো থাকে। বৃতির রং সবুজ, সংখ্যায় পাঁচটি, বেশ মোটা ও মাংসল। শ্বেত শুভ্র পাপড়ির সংখ্যা পাঁচটি। হলুদ রঙা পুংকেশরের সংখ্যা অগুন্তি। পুংকেশরগুলি ফুলের মধ্যে গর্ভকেশরকে ঘিরে বৃত্তাকারে দু'টি প্রস্তে বিন্যস্ত থাকে। বাইরের প্রস্তের পুংকেশরগুলি দৈর্ঘ্যে 13–15 মিলিমিটার এবং ঋজু আকৃতির। অন্যদিকে, ভেতরের প্রস্তের পুংকেশরগুলি 20–22 মিলিমিটার দীর্ঘ এবং বাঁকানো। চালতা ফুলের গর্ভমুণ্ডটি তারকাকৃতি। সব মিলিয়ে চালতা ফুলের গড়ন অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

বাংলায় আমরা প্রায়শই মানুষের ভদ্র আচার-ব্যবহার বোঝাতে 'সভ্য ভব্য' এই শব্দবন্ধটির ব্যবহার করে থাকি। আর আগেই জানিয়েছি যে, সংস্কৃতে চালতাকে 'ভব্য' বলা হয়। তাই একথা বলতে দ্বিধা নেই, ফুলের মত চালতার ফলও (চিত্র 2) দেখতে বেশ সুন্দর! এক-একটি চালতা ফল 5–12 সেন্টিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট, স্থায়ী মাংসল বৃতির দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো থাকে। চালতা অপ্রকৃত ফল কারণ, চালতার যে অংশটি খাওয়া হয়, সেটি আসলে ফুলের বৃতি। পনেরোটি গর্ভপত্র যুক্ত হয়ে প্রকৃতপক্ষে যে নলাকৃতি ফল (চিত্র 3) গঠন করে, তা এই স্থায়ী বা অটল বৃতির আড়ালে লুকিয়ে থাকে। ফলের ভেতর চটচটে আঠালো শাঁসে বীজ (প্রতিটি গর্ভপত্রে পাঁচটি করে মোট পঁচাত্তরটির মত) প্রোথিত থাকে। কাঁচা চালতা ফল টক স্বাদের হয়। অক্টোবর–নভেম্বর মাস ফল পাকার সময়। শীতকাল পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। পাকা চালতা ফল স্বাদে টক-মিষ্টি।

আচার (চিত্র 4), চাটনি, টক ডাল রান্নায় চালতার কাঁচা ফল ব্যবহৃত হয়। পাড়া-গাঁয়ের দিকে এখনও পাকা ফল থেঁতো করে নিয়ে নুন ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে মেখে খাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। অনেকে চালতা দিয়ে ছোট মাছের ঝোল রান্না করেন। পূর্ববঙ্গীয় রকমারি রান্নায় চালতার শাঁসের ব্যবহার লক্ষ্য করা হয়। চালতা ফল থেকে জেলি ও শরবত তৈরি হয়। অন্যান্য ব্যবহারের মধ্যে চালতার শক্ত কাঠ দিয়ে নৌকা তৈরী হয়।

সব মানুষই যে চালতা পছন্দ করেন এমনটা নয়। অনেকে মনে করেন, চালতা তেমন উপকারী নয়। তাই হয়তো বাজারে রকমারি ফলের ভিড়ে চালতা (চিত্র 5) কিছুটা নিষ্প্রভ থাকে। তবে মানুষের অবহেলার বস্তু হলেও, চালতা ফল হাতি, বাঁদর ও হরিণদের প্রিয় খাদ্য। বিশেষ করে হাতিরা এই ফলটি খুব পছন্দ করে এবং প্রাকৃতিক উপায়ে চালতার বীজ বিস্তারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

চালতা খাদ্যগুণ ও ওষধি গুণাগুণে ভরপুর। গবেষণায় জানা গেছে যে, চালতায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ট্যানিন, স্যাপোনিন, ম্যালিক অ্যাসিড, বিটুলিনিক অ্যাসিড, ফেনল এবং গ্লুকোজ থাকে। এছাড়া, ফলের মধ্যে ফ্ল্যাভোন, বিটা ক্যারোটিন, ট্রাইটারপিনয়েড, কুমারিন, ইত্যাদি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং

চিত্র 3: চালতার অন্দরমহল (ফটো: লেখক)।

ভিটামিন যেমন, ভিটামিন C, থায়ামিন, রাইবোফ্ল্যাভিন, ভিটামিন E, ইত্যাদি উপস্থিত থাকে। তাই চামড়ার স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা করতে ও বলিরেখা দূর করতে চালতার জুড়ি মেলা ভার। চালতা খাদ্যতন্তু সমৃদ্ধ ফল। তাই কৌষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। অনেকের মতে, চালতা হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা ঠিক রাখে। কারণ, চালতায় প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম থাকে। তবে শুধু হৃৎপিণ্ড নয়, জানা গেছে যে, যকৃতের ক্ষেত্রেও চালতা খুব উপকারী। এমনকি, নিয়মিত চালতার সেবন উচ্চ রক্তচাপের পাশাপাশি রক্তে শর্করা ও লিপিডের মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে।

চালতার অনেক রকম আয়ুর্বেদিক ব্যবহার আছে, যার উল্লেখ চড়ক ও সুশ্রুত সংহিতায় পাওয়া যায়। কচি চালতার রস ঠান্ডা লেগে জ্বর হলে এবং খুসখুসে কাশি নিরাময়ে সাহায্য করে। এছাড়া বাতের ব্যথাতে কচি চালতার রস জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়। খাদ্যে বিষক্রিয়ার দরুন সৃষ্ট বমি, পেটে যন্ত্রণা, পাতলা দাস্ত থেকে রেহাই পেতে চালতা গাছের মূলের ছালের রস বিশেষ ফলদায়ী। অন্যদিকে, রক্ত আমাশয়ের জন্য চালতার কচি পাতার রস সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। কেশাল্পতায় পাকা চালতার রস জল মিশিয়ে মাথায় মাখার রেওয়াজ আছে। মচকে যাওয়া ব্যাথায় চালতা গাছের পাতা ও মূলের ছাল বেটে অল্প গরম করে মচকানো জায়গায় প্রলেপ দিলে ব্যাথা কমে যায়। মুখে ঘা হলে কিংবা চামড়া উঠে গেলে চালতা খেলে ক্ষতস্থান তাড়াতাড়ি

চিত্র 4: সব বয়সের মানুষের কাছে চালতার আচারের বড় কদর (ফটো: লেখক)।

সেরে ওঠে। এছাড়া, গ্রাম-গঞ্জে গরুর পেট খারাপ হলে চালতা পাতা খাওয়ানো হয়।

চালতার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি সীমিত। গবেষণা যে একেবারেই হয় নি এমনটা নয়। তবে বিস্তারিত গবেষণা চালতার সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান দিতে পারে। সর্বোপরি চালতাকে ভবিষ্যতের অর্থকরী ফসল হিসাবে তুলে ধরতে পারে। ●

*লেখক **শ্রী দীপাঞ্জন ঘোষ** বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক, পত্রিকা সম্পাদক এবং লোকবিজ্ঞান প্রচারক।*
ইমেল: dpanjanghosh@gmail.com

চিত্র 5: দুর্গাপুজোর আগেই চালতা ফল বিক্রির জন্য বাজারে চলে আসে (ফটো: লেখক)।

গ্রহ উপগ্রহে প্রস্রবণের বৈচিত্র

আবু হানিফ শেখ

আমাদের সৌরজগতে বেশ কিছু গ্রহ-উপগ্রহের পৃষ্ঠে রয়েছে হিমায়িত তরল গ্যাসের (অ্যামোনিয়া, মিথেন, হাইড্রজেন, তরল নাইট্রোজেন) সাগর ও মহাসাগর। যেমন নেপচুনের ট্রাইটন, শনির এনসেলাডাস, বৃহস্পতির ইউরোপা, আইয়ো উপগ্রহ এবং মঙ্গল গ্রহ ইত্যাদি। সেই গ্যাসগুলি ভূপৃষ্ঠের নীচে প্রচন্ড চাপে বিস্ফোরিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে প্রস্রবণ সৃষ্টি করে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি উঁচু প্রস্রবণকে মহাকাশ থেকে উদ্গীরণ হতেও দেখা যায়। আমরা এই প্রবন্ধের মাধ্যমে সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের এই হিমায়িত গ্যাসের প্রস্রবণগুলিকে নিয়ে আলোচনা করব।

এই সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহে বায়বীয় সাগর মহাসাগর থেকে সৃষ্ট প্রস্রবণ গুলিকে উষ্ণ প্রস্রবণ বলা যায় না, আবার শীতল প্রস্রবণ বলাও যায় না। কেননা পৃথিবীর মতো সেইগুলি থেকে গরম জল (জলীয় বাষ্প) বা শীতল জল নির্গত হয় না। বরং তার পরিবর্তে সেখান থেকে বেশির ভাগ হিমায়িত গ্যাস (মিথেন, অ্যামোনিয়া, তরল নাইট্রজেন), উদ্বায়ী পদার্থ যেমন হাইড্রোজেন, কার্বন মনোক্সাইড এবং অন্যান্য উদ্বায়ী হাইড্রোকার্বন সহ বিভিন্ন ধরনের ক্যালোরিফিক গ্যাস বুদবুদ আকারে বাইরে বের হয়। তাই ধূম্ররন্ধ্রের ন্যায় তাদের গ্যাসের প্রস্রবণ বলা হয়।

ট্রাইটন

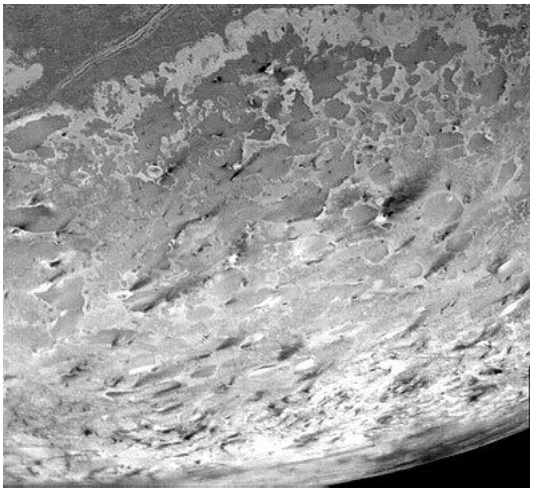

ট্রাইটন হল নেপচুন গ্রহের বৃহত্তম প্রাকৃতিক উপগ্রহ। 1846 সালের 10 অক্টোবর ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম লেসেল এটি আবিষ্কার করেন। ট্রাইটনের ব্যাস 2,710 কিলোমিটার। ট্রাইটনের পৃষ্ঠভাগ প্রধানত হিমায়িত নাইট্রোজেন এবং জলীয় বরফের একটি আস্তরণ দিয়ে গঠিত। ট্রাইটনের গড় ঘনত্ব 2.061 গ্রাম/সেমি^{3}।

এই উপগ্রহটির পৃষ্ঠভাগের তাপমাত্রা 38K (−235°সে)। বিজ্ঞানীদের মতে এখানে সক্রিয় স্বতঃনিঃসারী ঊষ্ণ প্রস্ববণের সন্ধান পাওয়া যায়। ট্রাইটন উপগ্রহটি ভূতাত্ত্বিক ভাবে সক্রিয় (এই জাতীয় অন্যান্য উপগ্রহগুলি হল বৃহস্পতির আইয়ো ও ইউরোপা এবং শনির এনসেলাডাস ও টাইটান)। এই কারণে ট্রাইটনের পৃষ্ঠভাগ অপেক্ষাকৃত নবীন এবং এই উপগ্রহে বেশ কয়েকটি সংঘাত গহ্বরও দেখা যায়। এই উপগ্রহের ভূতাত্ত্বিক গঠন জটিল এবং এর পৃষ্ঠভাগে হৈম আগ্নেয়গিরি বর্তমান। এর পৃষ্ঠভাগের কিছু অংশে কয়েকটি স্বতঃনিঃসারী উষ্ণ প্রস্রবণ দেখা যায়, যেগুলি নাইট্রোজেন গ্যাস উদ্গীরণ করে।

এনসেলাডাস

এনসেলাডাস হল শনির ষষ্ঠ বৃহত্তম উপগ্রহ। এটির ব্যাস প্রায় 500 কিলোমিটার (310 মাইল)। 1789 সালের 28শে আগস্ট উইলিয়াম হার্শেল এনসেলাডাস আবিষ্কার করেন।

এর ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ স্বচ্ছ বরফের আস্তরণে ঢাকা। তাই তাকে বরফের চাঁদ বলা হয়। আর এই পুরু বরফের নীচে তরল হাইড্রোকার্বনের মহাসাগরগুলি ঢাকা রয়েছে। মিথেন ও ইথেনের সাগর, মহাসাগর। এই পুরু বরফের চাদরটি হাইড্রোকার্বোনের বিশাল বিশাল সমুদ্র আর মহাসাগরে ভাসছে। তবে এই মহাসাগর গুলোর একেবারে নিচে প্রচন্ড চাপে জল ও হাইড্রোকার্বন বাষ্পীভূত হয়ে ধোঁয়ার মতো উপরে উঠে আসে।

এনসেলাডাসের উত্তর মেরুটি অনেক বেশি গর্ত যুক্ত। এবং দক্ষিণ মেরুটি টেকটোনিক ফাটল ও শৈলশিরায় আচ্ছাদিত। এই অঞ্চলটি জল-সমৃদ্ধ। দক্ষিণ মেরুর নিকটে ক্রায়োভলকানোগুলি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 200 কিলো জলীয় বাষ্প, আণবিক হাইড্রোজেন, উদ্বায়ী পদার্থ এবং

সোডিয়াম ক্লোরাইড স্ফটিক, বরফের কণা প্রভৃতি উপাদান উদ্গীরণ করে। এগুলোকে মহাকাশ থেকেই উদ্গীরণ হতে দেখা যায়। এই অঞ্চলটিতে এরকম একশোটিরও বেশি গিজার শনাক্ত করা হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে এই গিজারগুলির শক্তি ভূতাত্ত্বিক ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

মার্স

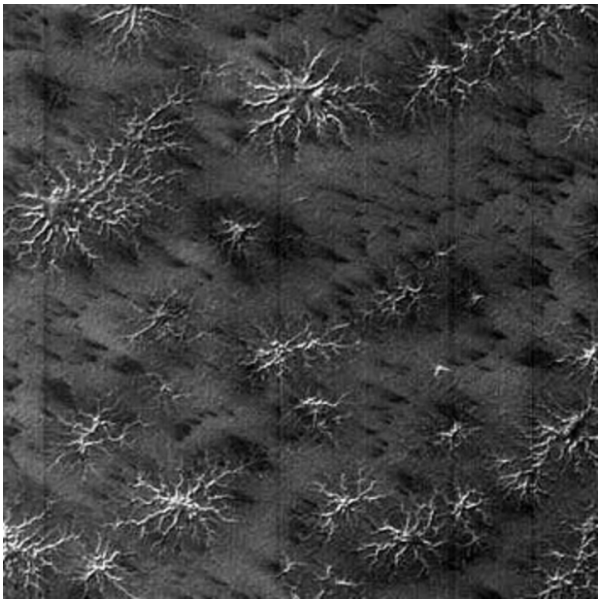

মার্স মঙ্গল গ্রহের ইংরেজি নাম। এটি 1610 সালে গ্যালিলিও গ্যালিলি প্রথম তার আবিষ্কৃত দূরবীন যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করেন। ডাচ গণিতবিদ ক্রিস্টিয়ান হাইজেনস তাকে বালি ঘড়ি সমুদ্র বলে নামকরণ করেন।

মঙ্গলের ভূত্বকটি কঠিন শিলা ব্যাসল্ট দিয়ে গঠিত। এর পৃষ্ঠভাগে আয়রন অক্সাইড বেশি থাকায় মাটি রং লাল হয়ে থাকে। তার মেরু দুটি কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড বা ড্রাই আইসে ঢাকা থাকে। তবে তার দক্ষিণ মেরুটি জলীয় বরফ দিয়ে তৈরি। এছাড়া তার পৃষ্ঠে উপত্যকা, পর্বত, গিরিখাত, মরুভূমি ও মেরুস্থ হিমছত্র ইত্যাদির অস্তিত্ব আছে। মঙ্গল গ্রহে পৃষ্ঠের নিচে প্রচুর পরিমাণে হিমায়িত জলের অস্তিত্ব আছে। এই ভূগর্ভস্থ জলের বরফগুলি স্কার্প বা শীট দ্বারা ঢাকা থাকে যা প্রায় 1 বা 2 মিটার পুরু মাটির একটি স্তর দ্বারা আবৃত। আর বরফের শীটগুলি পৃষ্ঠের নীচে থেকে 100 মিটার বা তার বেশি গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত। মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠে শুকনো বরফকে আঁকড়ে ধরে জলের বরফ রয়েছে। যাকে বরফ প্যাচ বলা হয়।

মঙ্গলের দক্ষিণমেরুর বরফের টুপির কাছাকাছি কিছু অঞ্চলে তুষারপাত হয়। ফলে মাটির উপরে 1 মিটার পুরু চকচকে শুষ্ক বরফের স্ল্যাব তৈরি হয়। বসন্তকালে সূর্যের আলো ভূপৃষ্ঠকে উষ্ণ করে এবং স্ল্যাবের নীচে CO_2 স্তরে চাপ তৈরি হয়। সেই চাপের ফলে স্ল্যাবগুলি উঁচু হতে থাকে। উঁচু হতে হতে শেষে স্ল্যাবগুলি ফেটেও যায়। ফলে গাঢ় বেসাল্টিক বালি বা ধুলোর সাথে মিশ্রিত কঠিন CO_2 গ্যাস গিজারের মতো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বাইরে নির্গত হয়।

ইউরোপা

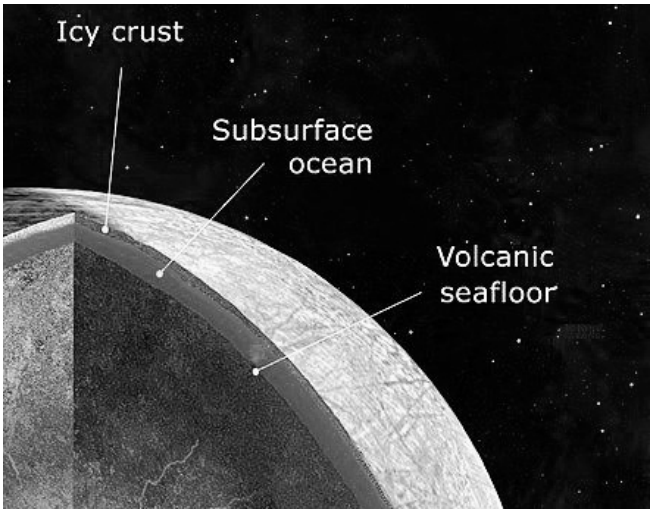

ইউরোপা, বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির মধ্যে অন্যতম। ইউরোপা আবিষ্কার করেন সাইমন মারিয়াস এবং গ্যালিলিও গ্যালিলি। ইউরোপা প্রধানত সিলিকেট শিলা বরফের আবরণে ঢাকা। এর কেন্দ্রটি সম্ভবত লোহা ও নিকেল দিয়ে গঠিত। এর হালকা বায়ুমন্ডল রয়েছে যা মূলত অক্সিজেন দিয়ে গঠিত। সৌরজগতের একমাত্র এই উপগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব বলে মনে করা হয়।

এর বরফের ভূত্বকের নীচে তরল জলের একটি উপতল সমুদ্র রয়েছে। এই মহাসাগরটিকে পৃথিবীর বাইরে জীবনের সন্ধানের জন্য সৌরজগতের অন্যতম প্রতিশ্রুতিশীল স্থান। ইউরোপার উপতল মহাসাগরের গভীরতা বেশ গভীর। এটির কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে 10 কিলোমিটার থেকে সম্ভবত 100 কিলোমিটার (প্রায় 62 মাইল) গভীরতা সহ একটি বিশ্ব মহাসাগর থাকতে পারে। সঠিক গভীরতা এখনও চলমান গবেষণা এবং অন্বেষণের বিষয়। ইউরোপার পৃষ্ঠ এবং এর চৌম্বক ক্ষেত্রের পর্যবেক্ষণ থেকে কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে। ইউরোপার বরফে ঢাকা সমুদ্রের তলায় কিছু ভূতাত্ত্বিক ঘটনা ঘটে চলেছে। যার কারণে উপগ্রহের বরফপৃষ্ঠের ফাটল বরাবর ফোয়ারার মতো জল বা বরফ নির্গত করে প্লাম বা গিজার সৃষ্টি করে যা পৃষ্ঠের উপরে 160 কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছায়। এই প্লামগুলিতে লবণ এবং জৈব অণুর চিহ্ন থাকতে পারে যা সমুদ্রের গঠন নির্দেশ করে। ●

লেখক আবু হানিফ শেখ বিজ্ঞান কর্মী ও লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ রচয়িতা। ইমেল: abuhanifsk1998@gmail.com

পাটিগণিতের জ্যামিতি

মনোতোষ কুমার মিত্র

পাটিগণিতের অঙ্গন থেকে কিছু সমস্যা তুলে ধরবো। এবং তার সমাধান পদ্ধতিতে একটা ভিন্নতর রূপ দেখার চেষ্টা করবো। বোঝার চেষ্টা করবো এরা বহিরঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন চেহারার হলেও অন্তরঙ্গে এদের ভিতর কোন গভীর সম্পর্ক আছে কিনা? দেখা যাক—

যেমন, **প্রশ্ন ১)** 5 টি বস্তুর মূল্য 100 টাকা হলে 2 টি বস্তুর মূল্য কত?

প্রশ্ন ২) 2 টাকা 5 টাকার কত শতাংশ?

প্রশ্ন ৩) 2 : 3 অনুপাতে মিশ্রিত দুটি উপাদান A ও B। 100 কেজি ওই উপাদানে A এর পরিমান কত?

প্রশ্ন ৪) A এবং B মুলধন যথাক্রমে 2000 টাকা এবং 3000 টাকা। 10000 টাকা লাভে A এবং B এর লভ্যাংশ কত?

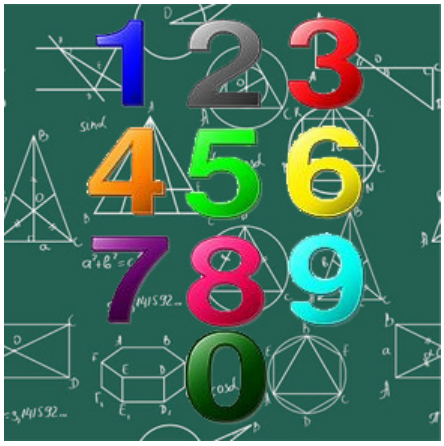

সংখ্যা পাল্টে আরও কয়েকটি সমস্যা তুলে ধরলাম:—

৫) 70 মিটার লম্বা একটা ট্রেন ঘন্টায় 75 কিমি যায়। ওই ট্রেনটি কত সময়ে 105 মিটার লম্বা একটা প্লাটফর্ম অতিক্রম করবে?

৬) 5 অশ্বক্ষমতা সম্পন্ন একটি পাম্প 36000 লিটার জল 8 ঘন্টায় উপরে তুলতে পারে। 7 অশ্বক্ষমতা সম্পন্ন পাম্পের 63000 লিটার জল তুলতে কত সময় লাগবে?

মাত্র ছয়টি সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় থেকে গ্রহণ করা হল। এই সমস্যাগুলো পাটিগণিত শিক্ষায় প্রত্যেকেই তার নিজস্ব মৌলিক স্বত্বা নিয়ে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে সংযোজিত। আর শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন ধারায় সমাধান করতে করতে ক্লান্ত ও ভীত। তাই ছাত্র ছাত্রীদের ক্লান্তি ও ভীতি কাটাতে দীর্ঘ দিনের অধ্যাবসায়ের পর একটি সুনির্দিষ্ট, একক ও মৌলিক পদ্ধতি প্রকাশের চেষ্টা করবো। যা পাটিগণিতের ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গির আঙ্গিককে যেমন কেবলমাত্র একটি সুনির্দিষ্ট আঙ্গিকে প্রকাশ করতে সক্ষম। পাশাপাশি পাটিগণিতের দীর্ঘ দিনের প্রসুত ধারণা বিমূর্ত রূপের আড়াল থেকে প্রকৃত মূর্ত রূপটি তুলে ধরে দেখানো যাবে যে বাইরের রূপের আড়ালে প্রতিটি সমস্যার জ্যামিতিক চেহারা একই। তাই সমাধানের পদ্ধতিও এক হওয়া উচিত।

এই গাণিতিক সমস্যাগুলোর মুল কাঠায়ো পকৃত অর্থে এক এবং একটি মাত্র সহজ জ্যামিতিক সাহায্যে যে সমাধান করা সম্ভব তা ভাবনার অতীত ছিল। ঠিক যেমন প্রতিটি মানুষের অন্তরীণ কাঠামোয় 206 টি হাড়ের সহাবস্থান। কিন্তু বাইরের অবয়বে প্রত্যেকেই পৃথক স্বত্ত্বায় তার মৌলিকত্ব বজায় রেখে চলেছে। তাহলে, এবার দেখা যাক—ভিন্ন ধর্মীয় প্রশ্নের একই প্রকার সমাধানের রূপ। উত্তরগুলো যথাক্রমে দেওয়া হলো।

উত্তর—১) 5টি বস্তুর মূল্য = 100 টাকা

1টি বস্তুর মূল্য = 100/5 = 20 টাকা

2টি বস্তুর মূল্য = 20 × 2 = 40 টাকা। (ঐকিক নিয়ম বা, unitary method)

উত্তর—২) শতাংশের বিচারে 5 টাকা হলো 100 শতাংশ। তাহলে 2 টাকা কত শতাংশ?

অর্থাৎ আগের মতই, 5 টাকা যদি হয় 100 শতাংশ

1 টাকা তাহলে 100/5 = 20 শতাংশ

2 টাকা তাহলে 20 × 2 = 40 শতাংশ। (ঐকিক নিয়মে)

উত্তর—৩) মোট উপাদানের প্রসঙ্গে A : B = 2 : 3, তাই মোট অনুপাত 2 + 3 = 5. তাই সমস্যাটিকে একেবারে ঐকিক নিয়মে ফেলে করা যায় কিনা দেখবো, সমাধান সম্ভব কিনা!

5 ভাগের পরিমাণ যদি হয় 100 কেজি

1 ভাগের পরিমাণ হয় 100/5 = 20 কেজি

2 ভাগের পরিমাণ হলো 20 × 2 = 40 কেজি। (একেবারে সরল ঐকিক নিয়মে)

উত্তর—৪) A ও B এর মুলধনের অনুপাত = 2000 : 3000 = 2 : 3 এটা উপলব্ধি করা কঠিন নয় মোটেই।

এই অনুপাত সমষ্টি = 2 + 3 = 5

5 ভাগ যদি হয় 10000 টাকা

1 ভাগ হবে 5 = 2000 টাকা

তবে A এর লভ্যাংশ হবে 2 × 2000 = 4000

এবং B এর লভ্যাংশ হবে 3 × 2000 = 6000 টাকা।

এর থেকে প্রমাণিত হয় যে গণিতের প্রতিটি ভিন্নমুখী অধ্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা থাকলেও এদের সমাধান পদ্ধতি একটি মাত্র সাধারণ নিয়মেই করা সম্ভব।

আসলে পাটিগণিতের এই জাতীয় সমস্যাগুলি দ্বিমাত্রিক এবং সমানুপাতের ধর্মে আবিষ্ট। এবং জ্যামিতিক আঙ্গিকে গণিতবিদ থ্যালেসের উপপাদ্য সমকোণী ত্রিভুজের উপর প্রয়োগ। এবার উপরের সমস্যাগুলোর জ্যামিতিক সমাধান দেখা যাক--প্রথম প্রশ্নের উত্তরের সাপেক্ষে বলা যায় দ্বিমাত্রিক চিত্রে A (5, 100) বিন্দু মুলবিন্দুর সাপেক্ষে অক্ষদ্বয়ের সাথে যে সমকোণী ত্রিভুজ AOB সৃষ্টি করে, C (2, x) বিন্দু মুলবিন্দুর সাপেক্ষে অক্ষদ্বয়ের সাথে গঠিত COD সমকোণী ত্রিভুজের

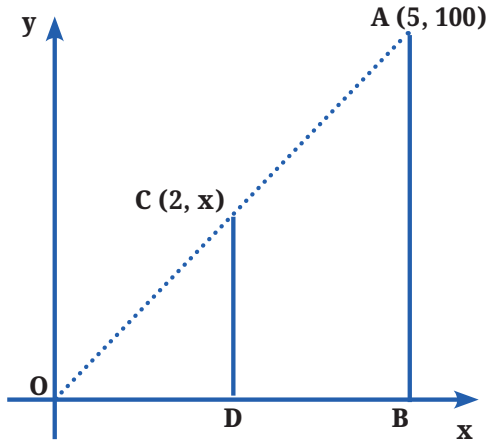

সাথে সদৃশকোণী। তাই অনুরূপ বাহুগুলি পরস্পর সমানুপাতি। অর্থাৎ, A, C বিন্দু সংযোজক সরলরেখা সর্বদা মূলবিন্দুগামী।

অর্থাৎ, AB/CD = OB/OD,

অর্থাৎ, 5/2 = 100/x, x= 40 টাকা।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, A (5, 100) বিন্দুর সাপেক্ষে C (2, x) বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করতে হবে যাতে A, C সংযোজক l সরলরেখা মুলবিন্দুগামী হয়। অর্থাৎ। বিন্দুদ্বয় মুলবিন্দু ও অক্ষদ্বয়ের সাপেক্ষে যে দুটি সমকোণী ত্রিভুজ AOB, COD সৃষ্টি করে তারা পরস্পর সমানুপাতি।

অর্থাৎ, 5/2 = 100/x, x = 40 শতাংশ।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, উপাদান দুটি A এবং B এর অনুপাত 2 : 3 ; এর অর্থ মোট 2 + 3 = 5 ভাগ পূর্ণতা তথা 100 কে চিহ্নিত করে। তাই, A (5, 100) বিন্দুর সাপেক্ষে B (2, x) বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করতে হবে যাতে A, B বিন্দুদ্বয় সংযোজক রেখা মুলবিন্দুগামী হয়। অর্থাৎ, উক্ত বিন্দুদ্বয় মুলবিন্দুর সাপেক্ষে যে সমকোণী ত্রিভুজ সৃষ্টি করে তারা পরস্পর সমানুপাতি। তাই, 5/2 = 100/x, x = 40 কেজি।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, A এবং B এর মুলধনের অনুপাত 2 : 3. অর্থাৎ মোট 2 + 3 = 5 ভাগ হলো পূর্ণতা। তাই A (2, 5) বিন্দুর সাপেক্ষে (x, 10000) বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করতে হবে যাতে A এবং B বিন্দুদ্বয় সংযোজক রেখা মুলবিন্দুগামী হয়। অতএব,

x= 4000 টাকা। একইভাবে B এর লভ্যাংশ নির্ণয় করা অত্যন্ত সহজ।

পাঁচ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, A {(75000), (60 × 60)} বিন্দুর সাপেক্ষে অপর একটি বিন্দু B (175, x) নির্ণয় করতে হবে যাতে A, B বিন্দুদ্বয় সংযোজক রেখা মুলবিন্দুগামী হয়। অর্থাৎ, দ্বিমাত্রিক তলে A এবং B বিন্দুদ্বয় মুলবিন্দুর সাপেক্ষে যে দুটি সমকোণী ত্রিভুজ সৃষ্টি করে তারা পরস্পর সমানুপাতিক। অর্থাৎ

75000/175 = (60 × 60)/x, x = 8 মিনিট 24 সেকেন্ড।

ছয় নং প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, সমস্যাটি ত্রৈরাসিক। তাই দুটি দশায় সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করবো। প্রথমটি সমানুপাতিক সুত্রে, দ্বিতীয় অংশটি ব্যাস্তানুপাতিক সুত্র প্রয়োগ করে। এই ব্যাস্তানুপাতিক চিত্রটি অনেক চেষ্টার পরে সম্ভব হয়েছে। যাক এবার আসি প্রসঙ্গে—

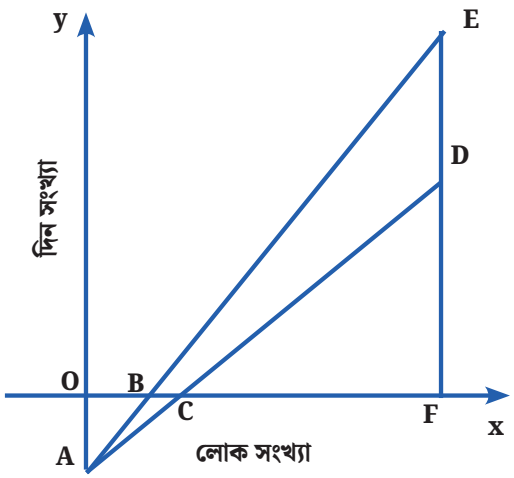

প্রথমেই ব্যাস্তানুপাতিক ক্ষেত্রটির জন্য, নির্দিষ্ট পরিমাণ জল তোলার ক্ষেত্রকে অপরিবর্তিত রেখে, A (5, 8) বিন্দুর সাপেক্ষে অপর একটি বিন্দু B (7, x) বিন্দু নির্ণয় করতে হবে যাতে বিন্দুদ্বয় পরস্পর ব্যাস্তানুপাতিক হয়। অর্থাৎ, 5/7 = x/8, x = 40/7 ঘন্টা। চিত্রে, OB/OC = DF/EF

দ্বিতীয় পর্যায়ে, সমানুপাতিক ক্ষেত্রের জন্য,

P (36000, 40/7) বিন্দুর সাপেক্ষে অপর একটি বিন্দু Q (63000, y) নির্ণয় করতে হবে যাতে P, Q বিন্দুদ্বয় সংযোজক রেখা মুলবিন্দুগামী হয়। অর্থাৎ, P, Q বিন্দদ্বয় মুলবিন্দুর সাপেক্ষে যে দুটি সমকোণী ত্রিভুজ সৃষ্টি করে তারা পরস্পর সমানুপাতিক।

অর্থাৎ, চিত্রে, PQ/OP = MN/OM

(40/7)/36000 = y/63000, y = 10 ঘন্টা।

এবার কি দাবি করা যায় না, এই বিষয়টি গণিতকে অত্যন্ত সহজসাধ্য করে তুলবে।

এবার ব্যাস্তানুপাতিক সম্পর্কের একটা সমস্যা তুলে ধরে তার জ্যামিতিক চিত্রায়ণ ও সমাধান কেমন হবে দেখা যাক।

যেমন, মঙ্গলপুর গ্রামের একটি আশ্রয় শিবিরে 4000 জন লোকের 9 দিনের খাদ্য মজুত ছিল। 3 দিন পরে 1000 জন লোক অন্য জায়গায় চলে গেলেন। যারা রয়ে গেলেন তাদের ওই খাদ্যে আর কতদিন চলবে?

জ্যামিতির সমাধান:— OA নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যকে অপরিবর্তিত রেখে, x, y অক্ষদ্বয় বরাবর যথাক্রমে লোকসংখ্যা ও দিনসংখ্যাকে প্রতিস্থাপিত করে চিত্র অঙ্কণ করি। OC = 4000 জন।

ত্রিভুজ AOC এর সাপেক্ষে সময় DF = 9 – 3 = 6 দিন।

OB = 3000 জন। ত্রিভুজ AOB এর সাপেক্ষে EF = x দিন ধরি।

যেহেতু সম্পর্কটি ব্যাস্তানুপাতিক।

অতএব, OB/OC = DF/EF = > 3000/4000 = 6/x.

বা, x = (6 × 4000)/3000 = 8 দিন। ●

*লেখক **শ্রী মনোতোষ কুমার মিত্র** গণিতের শিক্ষক এবং গণিত বিষয়ক বহু বই ও প্রবন্ধের রচয়িতা।*
ইমেল: manotoshkumar.mitra@gmail.com

কয়লা-শক্তির জন্মস্থান চিরতরে কয়লার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল

মানস রায়

তিনশ বছর আগে ব্রিটেনে শুরু হয়েছিল কয়লার জয়যাত্রা, গত 30 সেপ্টেম্বর, 2024 চিরতরে স্তব্ধ হল সেই যাত্রা। ওই দিন ব্রিটেন তার ব্রিটেন তার শেষ কয়লা-বিদ্যুৎ কেন্দ্র; 2000 মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন Ratcliffe-on-Soar এ (চিত্র 1) উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। 1882 সালে লন্ডনের হলবোর্ন ভায়াডাক্টে বিশ্বের প্রথম কয়লা-জ্বালানো পাওয়ার প্ল্যান্টটি বিদ্যুত উৎপাদন শুরু করার 142 বছর পরে ব্রিটেনের বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার কোন ভুমিকা রইল না। কয়লার স্থান পূর্ণ করেছে গ্যাস, সৌরশক্তি, বায়ু ও জলবিদ্যুৎ। শুধু বিদ্যুৎ নয়, শিল্প ও জীবনযাত্রার সর্ব স্তরেই কয়লা একদম বর্জিত। কয়লা থেকে প্রায় 142 বছর ধরে অবিরাম বিদ্যুৎ উৎপাদনের পর Ratcliffe-on-Soar এ বন্ধ হওয়া সত্যিই ব্রিটেনের জন্য একটি যুগের সমাপ্তি।

কয়লা জ্বালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেক আগে থেকেই কয়লার ব্যবহার সম্ভব করেছিল এক শিল্প বিপ্লব এবং ব্রিটেনকে নিয়ে গিয়েছিল বিশ্বের প্রধান, শিল্পোন্নত অর্থনীতিগুলির শীর্ষে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবহন, শিক্ষা—সব ক্ষেত্রে এসেছিল নতুন চিন্তা ভাবনার জোয়ার।

শ্রপশায়ারের একটি ছোট গ্রাম কোলব্রুকডেলকে বলা হয় শিল্প বিপ্লবের মূল কেন্দ্র কারণ এখানেই 1709 সালে আব্রাহাম ডার্বি আবিষ্কার করেছিলেন কিভাবে কাঠকয়লার পরিবর্তে কোক (কয়লার একটি বিশুদ্ধ রূপ) ব্যবহার করে উচ্চ তাপমাত্রায় লোহার আকরিক গলানো যায়। এই আবিষ্কারটি লোহার উৎপাদনকে এক নতুন পর্যায়ে নিয়ে যায়। আর লোহা ছাড়া শিল্প বিপ্লব কল্পনাই করা যায় না। ব্রিটেনে লোহার বার্ষিক উৎপাদন 1700-এর দশকে প্রায় 2,500 টন থেকে 1750-এ 28,000 টন, এবং 1850 এর মধ্যে 2,500,000 টনে বৃদ্ধি পায়। এক কথায় হাজার গুণ বৃদ্ধি। কয়লা ছাড়া এই পরিমাণ ইস্পাত উৎপাদন সম্ভব হতো না। এখন দেখা যাক যদি বৃক্ষনিধনের মধ্যে দিয়ে পাওয়া কাঠকয়লাই কেবল ব্যবহার করে লোহা উৎপাদন করতে হত তাহলে কী হত? একটি হিসেবে বলা হয়েছে যে যদি ব্রিটেনের অর্ধেক ভূমির গাছ কেটে লোহা

চিত্র 1. Ratcliffe-on-Soar তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

চিত্র 2 , কয়লা থেকে তৈরি টাউন গ্যাসের আলো, লন্ডন

বা শিল্পের জন্য বিশুদ্ধভাবে কাঠকয়লা সরবরাহ করা হত, তাহলেও লোহা উৎপাদন সর্বোত্তমভাবে বছরে 1.25 মিলিয়ন টন বা 1850 সনের উৎপাদনের অর্ধেক হত। অর্থাৎ এক বছরের লোহা উৎপাদন করতে অর্ধেক ব্রিটেন মরুভূমি হয়ে যেত। সুতরাং, ডারটি ফুয়েল (dirty fuel) বা নোংরা জ্বালানী বদনামের তকমায় চিহ্নিত কয়লা যে ব্রিটেন ও ইওরোপের বৃক্ষ সম্পদ রক্ষায়ও একদা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছিল সেটা আজ অনেকেই ভুলে যান।

লোহার পর্যাপ্ত উৎপাদন এবং উন্নত ধাতুবিদ্যার বিকাশের ফলে ভারী ওজন বহনে সক্ষম সেতু নির্মাণ এবং ব্রিটেনের বিস্তৃত রেল নেটওয়ার্ক তৈরি সম্ভব হল। তার সঙ্গে বাস্তবায়িত হল, মেশিন এবং ইঞ্জিনগুলি তৈরি করার কারখানা। আর এই স্টিমশিপ বা বাষ্পচালিত জাহাজ এবং লোকোমোটিভগুলিকে শক্তির যোগান দিতে শুরু করল।

ধাতু উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেওয়ার পাশাপাশি, কয়লা ক্রমবর্ধমানভাবে শিল্প বিপ্লবের সময় শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকল। এটি যে তাপ শক্তি তৈরি করেছিল তা বাষ্প ইঞ্জিনের বিকাশের মাধ্যমে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। প্রথম বাষ্প ইঞ্জিন, যা 1712 সালে টমাস নিউকোমেন তৈরি করেছিলেন তার লক্ষ্য ছিল, কয়লা খনি থেকে জল পাম্প করে তোলা। বাষ্পচালিত পাম্প আবিস্কারের আগে কয়লা খনিগুলি বেশি গভীর করা যেত না, ভুগর্ভস্থ জলে খনি ভরে যেত। কিন্তু নিউকমেন বাষ্প ইঞ্জিনে চালিত পাম্প খনির শ্যাফ্টগুলিকে অনেক গভীর করতে সাহায্য করল, এবং এইভাবে যথেষ্ট পরিমাণে কয়লার খনন ও সরবরাহ নিশ্চিত হল। বলা যায়, কয়লা ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে উঠে আসা উদ্ভাবনা নিরাপদে আরও কয়লা উত্তোলনের কাজে সহায়ক হয়ে উঠল।

যুক্তরাজ্যের শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, এবং 18 শতকের শেষের দিকে—এবং অবশ্যই 19 শতকের প্রথমার্ধে আর তার মধ্যে দিয়ে ব্রিটেন একটি কয়লা শক্তি অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছিল। এটি ছিল বিশ্বের প্রথম কয়লানির্ভর অর্থনীতি। শিল্পের বাইরে মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও কয়লার সরাসরি বা কয়লা ভিত্তিক বস্তুর প্রভাব ক্রমশঃ বাড়তে থাকল। 1792 সালের দিকে স্কটসম্যান উইলিয়াম মারডক (1754–1839) প্রথম দেখান যে আলোর জন্য কয়লা থেকে তৈরি গ্যাস ব্যবহার করা যেতে পারে। আলোকসজ্জার এই নতুন এবং উজ্জ্বল উত্সটি তেল বা লম্বা মোমবাতি জ্বালানোকে প্রতিস্থাপিত করল। 1807 সালে রাস্তার আলোর জন্য কয়লা গ্যাস ব্যবহার করার ধারণাটি প্রবর্তন করেন জার্মান উদ্ভাবক ফ্রেডরিক অ্যালবার্ট উইনসর (1763–1830)। উইনসর চমৎকার ভাবে লন্ডনের প্যাল মল থেকে সেন্ট জেমস পার্ক

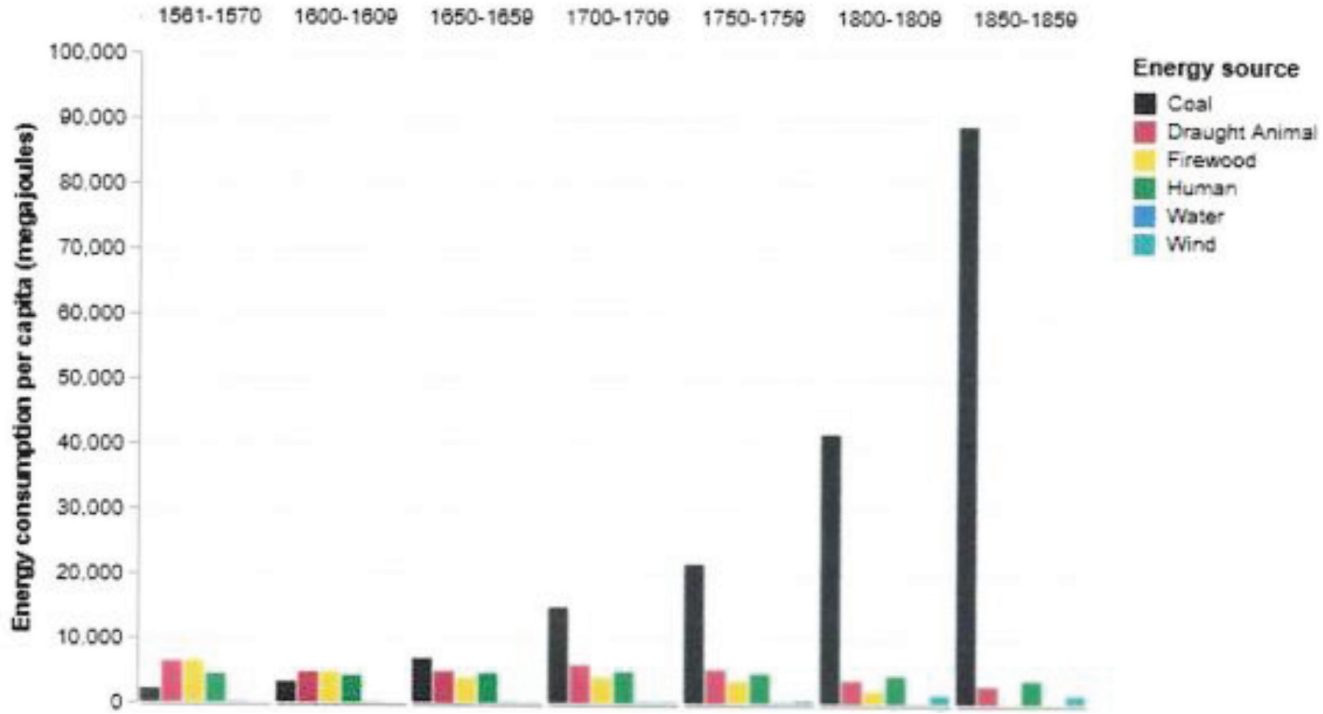

চিত্র 3. অন্যান্য উত্সের তুলনায় শক্তির উত্স হিসাবে কয়লার উত্থান—ইংল্যান্ডে মাথাপিছু শক্তি (মেগাজুল এককে) ব্যবহারের পরিবর্তন (1561–1859).

পর্যন্ত গ্যাস স্ট্রিটলাইট স্থাপন করে তার উদ্ভাবনের বাস্তব প্রয়োগের সম্ভাব্যতা প্রদর্শন করেছিলেন। এই পথটি বেছে নেওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হল ইংল্যান্ডের রাজা এই পথটি যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করে থাকেন, এবং সেইজন্য পথটির এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

পরবর্তী এক দশকে লন্ডনে চল্লিশ হাজার গ্যাস স্ট্রিটলাইট দেওয়া হয়। এটি শীঘ্রই অন্যান্য ব্রিটিশ শহর এবং বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। 1816 সালে, বাল্টিমোর কয়লা গ্যাস রাস্তার আলো ব্যবহার করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম শহর হয়ে ওঠে; প্যারিস 1820 সালে এটি অনুসরণ করে। কলকাতার রাস্তায় এই কয়লা-গ্যাসের আলো চালু হয় 1885 সালে।

রাস্তায় আলো পরিবর্তন আনল মানুষের জীবনযাত্রায়, অভ্যাসে। আগে রাতের বেলা বাইরে বের হওয়া নিরাপদ ছিল না, রাস্তা আলোকিত হওয়ার পরে রেস্তোরাঁ এবং বিনোদন প্রতিষ্ঠানগুলি আগের তুলনায় অনেক বেশি গ্রাহককে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। নাইট লাইফ বলে আগে কিছু ছিল না কয়লা যুক্ত করল এক নতুন জীবন শৈলী। মানুষের বাড়িতে রান্না এবং উষ্ণতার (হিটিং) জন্যও কয়লা গ্যাস ব্যবহার করা হল। 1850 সালের মধ্যে, ব্রিটেনের প্রতিটি বড় শহরে গ্যাসওয়ার্ক ছিল। গরম করার জন্য কয়লা এবং গ্যাসের অর্থ হল যে এত পরিমাণে কাঠের আর প্রয়োজন নেই। এর ফলে উপকৃত হল কৃষিও। কারণ বনের জন্য সংরক্ষিত আগেকার জমি এখন কৃষিকাজে ব্যবহারের করার অনুমতি মিলল।

কয়লার ব্যবহার বদলে দিয়েছিল ব্রিটেনের ভূমিদৃশ্য (ল্যান্ডস্কেপ), কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে 1750 সাল থেকে সমস্ত বড় নদী ও তাদের উপনদীগুলিকে সংযুক্ত করার পাশাপাশি খাল ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে কারণ এটি ভারী পণ্য পরিবহনের সবচেয় সরল ও স্বল্পব্যয়ী উপায়।

1700 সাল থেকে ব্রিটেনে শক্তির একটি প্রধান উৎস হয়ে ওঠে কয়লা, পরবর্তী 250 বছরে এটি ক্রমশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে (চিত্র 4)। কয়লা উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায়, 1815 সালের মধ্যে 16 মিলিয়ন টন এবং 1830 সালের মধ্যে 30 মিলিয়ন টনে পৌঁছায়। সেই সময় ব্রিটেন বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ কয়লা খনন করত। কয়লা উৎপাদন 1913 সালে 292 মিলিয়ন মেট্রিক টনে পৌঁছেছিল. এবং শিল্পটি প্রায় 1.2 মিলিয়ন লোককে নিযুক্ত করেছিল। 1990 সাল থেকে কয়লা উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পেয়েছে, 2017 সালে কমে হয়েছে 20 মিলিয়ন মেট্রিক টন। 2023 সালে, যুক্তরাজ্য শুধুমাত্র এক মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন করেছিল।

কয়লা-শক্তির ব্যবহার শিল্পগুলিকে আধুনিক করতে সাহায্য করেছিল, কারখানাগুলিতে মানুষের শ্রমশক্তির স্থান নিয়েছিল কয়লা-শক্তি চালিত যন্ত্র। তার বিপরীতে, কয়লা উৎপাদন, অর্থাৎ খনির কাজ ছিল শ্রমনিবিড় এক প্রক্রিয়া এবং দেশের অন্যতম প্রধান নিয়োগকর্তা ছিল কয়লা খনিগুলি প্রধান নিয়োগকর্তা। চিত্র 5 কয়লা উৎপাদন এবং কয়লা খনিতে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা দেখায়। 1900 সালে 7% এর বেশি কর্মজীবী মানুষ কয়লা খনিতে নিযুক্ত ছিলেন। কয়লা খনির কর্মশক্তি

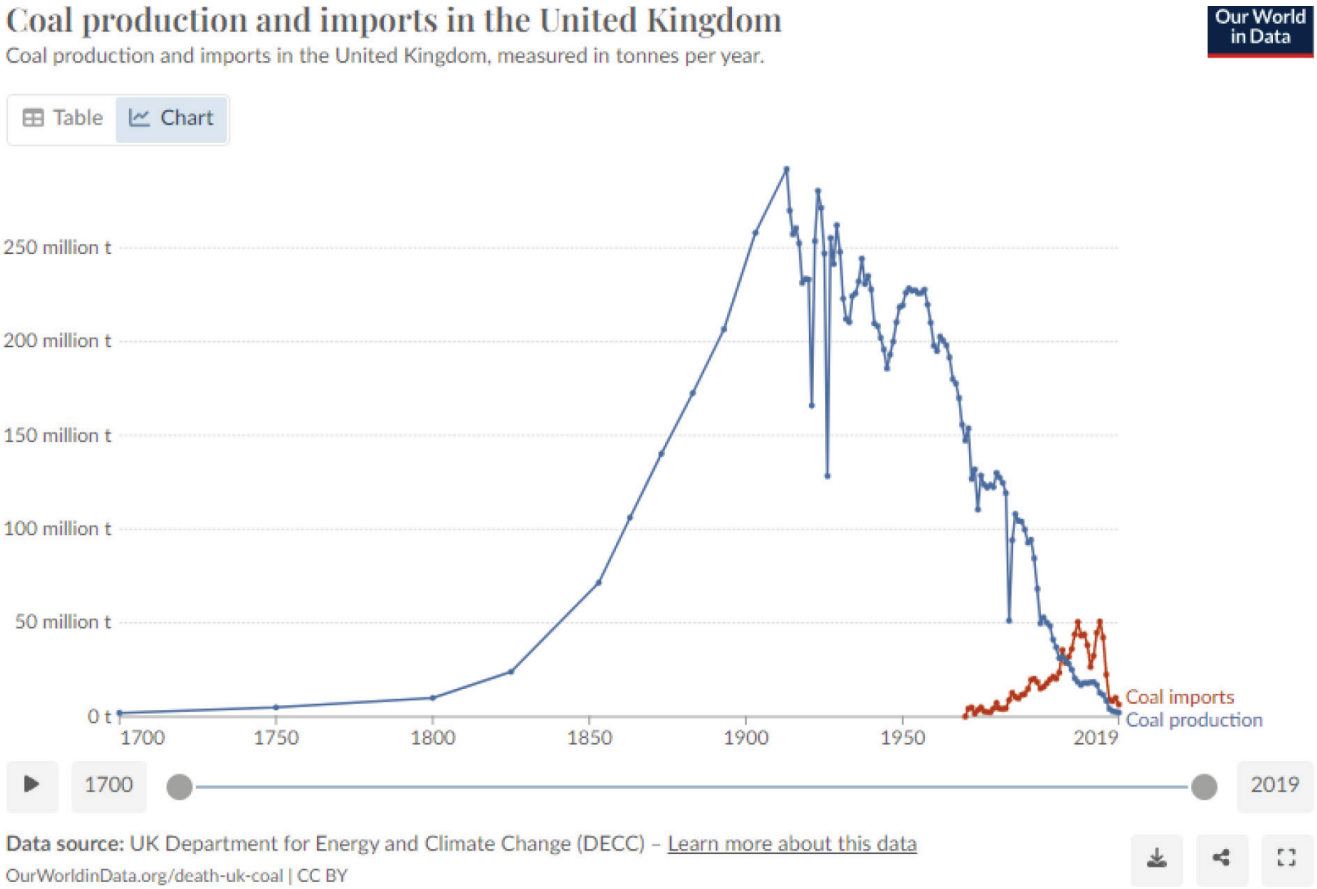

চিত্র 4. ব্রিটেনে কয়লা উৎপাদন এবং আমদানী (1700-2019)

1950-এর দশকে ছিল 700,000-এর বেশি। সেখান থেকে 1970-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে টা 300,000-এরও কমে নেমে আসে।

বিশ শতকের পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিদ্যুৎ ছাড়াও পরিবহন (রেল), রান্নার ও ঘরের তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য গ্যাস, কারখানার বয়লারে আর ইস্পাত শিল্পে কয়লার ব্যবহার ব্যাপক ছিল (চিত্র 6)। এর পরই তা কমতে থাকে এবং ঐ শতকের আশির দশকে প্রধানতঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং কিছুটা লৌহ শিল্পে কয়লার ব্যবহার টিকে থাকে।

এরপর চিত্র 7-এ আমরা দেখতে পাই যে শক্তির উত্স হিসাবে কয়লার আধিপত্য 1950 সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। সেই সময় থেকে তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস তাকে প্রতিস্থাপন করতে শুরু করেছিল। 2000 সালের মধ্যে, কয়লা দেশের শক্তির মাত্র 19% সরবরাহ করত, তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস যথাক্রমে 30.9% এবং 39.5% সরবরাহ করত। 2010-এর পর, যুক্তরাজ্যে কোনো নতুন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করা হয়নি। বায়ু দূষণ কমিয়ে আনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক কঠোর নিয়ম উঠে এসেছে। তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে সেই সব শর্ত মেনে তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির আধুনিকীকরণ হয়ে উঠেছে প্রভূত ব্যয়বহুল। ফলতঃ অনেক পুরানো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অর্থনৈতিক দিক থেকে বন্ধ করে দেওয়াটাই লাভজনক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

নবায়নযোগ্য (renewable) উৎসগুলি থেকে এখন ব্রিটেনে তার প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের 40 শতাংশ আসে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার 2030 সালের মধ্যে অ-ফসিল-জ্বালানি উত্স থেকে দেশের সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে।

কেবল ব্রিটেন নয় সমস্ত উন্নত দেশেই কয়লা ও অন্যান্য ফসিল-জ্বালানি বর্জনের প্রচেষ্টা দ্রুতগতিতে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কয়লার অবদান মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাত্র 16 শতাংশ, প্রাকৃতিক গ্যাস সেখানে বিদ্যুতের 40 শতাংশেরও বেশি সরবরাহ করে। বিপরীতে, ফ্রান্স তার বিদ্যুতের সবচেয়ে বেশি অংশ আসে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে, যখন ডেনমার্ক তার 80 শতাংশ শক্তি পুনর্নবীকরণযোগ্য, প্রধানত বায়ু থেকে সংগ্রহ করে।

শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনে নয়, কয়লার ব্যবহার বন্ধ স্টিল প্লান্টেও। টাটা স্টিল সম্প্রতি পোর্ট টালবোটে ব্রিটেনের বৃহত্তম স্টিলওয়ার্কের দুটি চুল্লি (ব্লাস্ট ফার্নেস} বন্ধ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। ব্লাস্ট ফার্নেস, যা লোহা

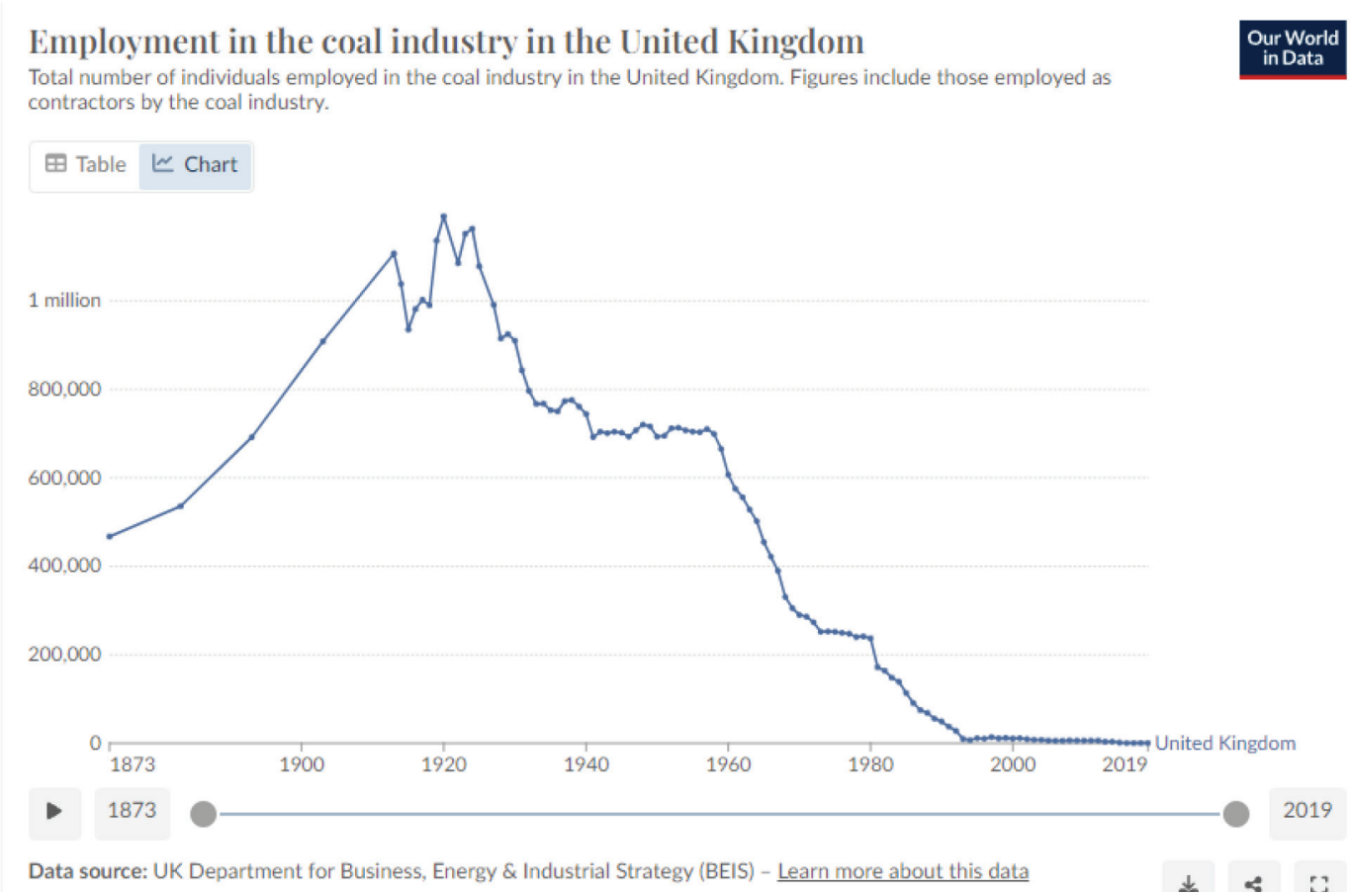

চিত্র 5. ব্রিটেনে কয়লাখনি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের পরিবর্তন (1873-2019)

চিত্র 6. বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে একুশ শতকের দুই দশক পর্যন্ত ব্রিটেনে কয়লা ব্যবহারের ক্ষেত্রের পরিবর্তন

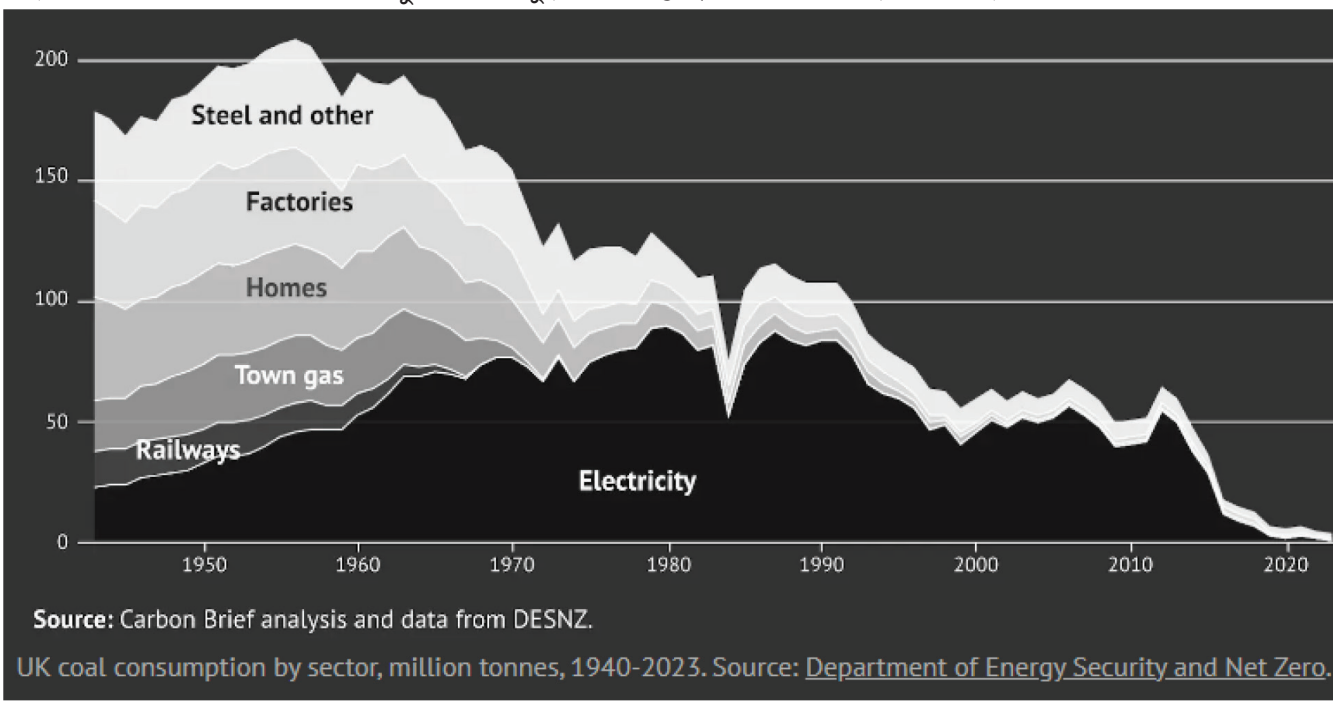

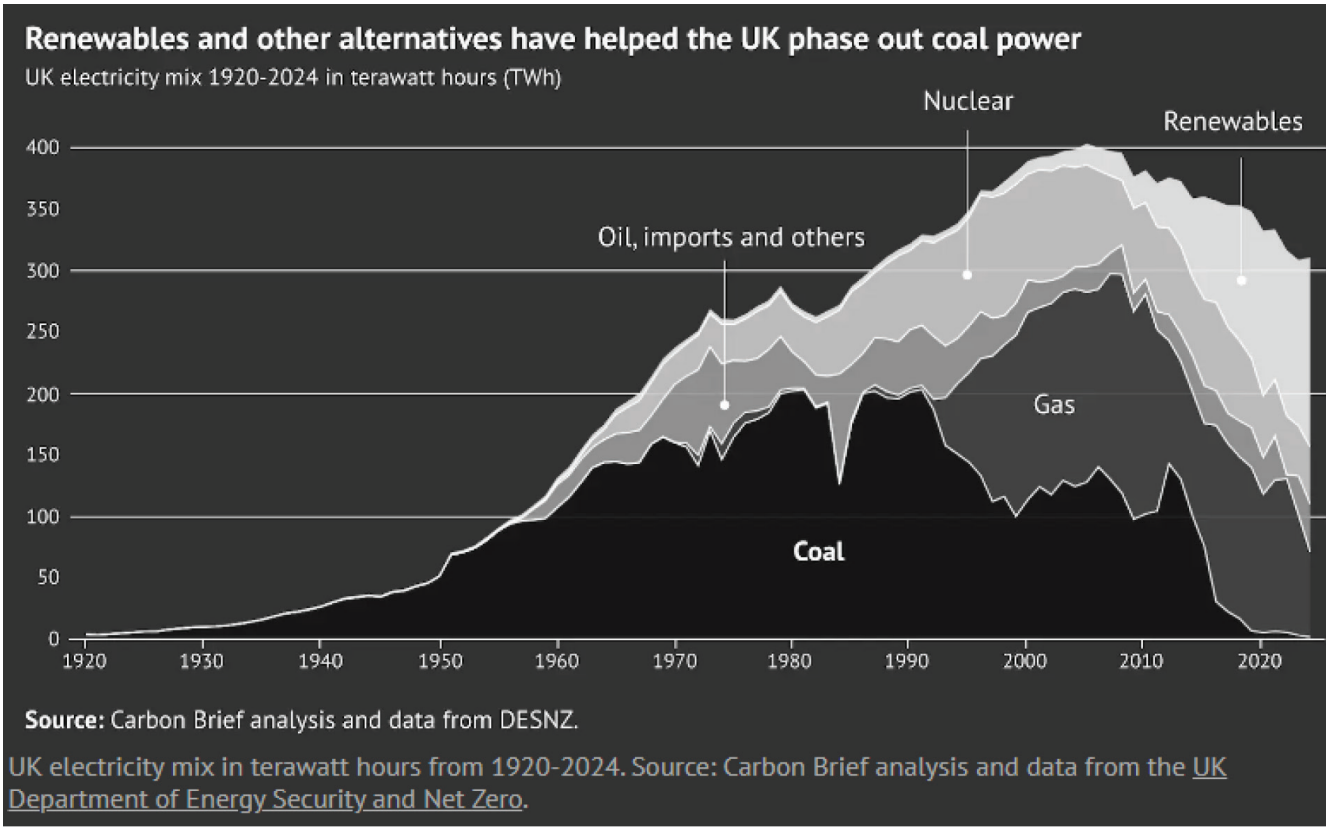

চিত্র 7. কয়লার বিকল্প হিসেবে উঠে আসা শক্তির অন্যান্য উৎসগুলি কীভাবে ব্রিটেনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কয়লার ব্যবহার ধীরে ধীরে কমিয়ে এনেছে

আকরিক থেকে ইস্পাত তৈরি করে, বৈদ্যুতিক আর্ক ফার্নেস দিয়ে প্রতিস্থাপিত হবে, যা স্ক্র্যাপ মেটাল থেকে ইস্পাত পুনরুৎপাদন করে। ব্রিটিশ স্টিল গত বছর ব্রিটেনের অন্য দুটি ব্লাস্ট ফার্নেসকে বৈদ্যুতিক আর্ক ফার্নেস দিয়ে প্রতিস্থাপন করার জন্য একই ধরনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। ফলস্বরূপ, ব্রিটেনে আর ব্লাস্ট ফার্নেস থাকবে না এবং আকরিক লোহা থেকে নতুন বা একেবারে আনকোরা ইস্পাত তৈরি করার ক্ষমতা হয়ে যাবে শূন্য।

যুক্তরাজ্য একসময় বিশ্বের বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদনকারী ছিল। স্টিলওয়ার্কের টাওয়ার এবং চিমনিগুলি ছিল ব্রিটেনের শিল্প ঐতিহ্য এবং স্কানথর্প এবং পোর্ট ট্যালবোটের মতো শহরের পরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দু। স্থানীয় শ্রমিকদের বেশ কয়েকটি প্রজন্ম এই শিল্পে নিযুক্ত হয়েছে। পোর্ট টালবোটে ব্লাস্ট ফার্নেস বন্ধ হওয়ার ফলে প্রায় 3,000 চাকরি হারানোর আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং স্কানথর্পে ব্লাস্ট ফার্নেস বন্ধ হওয়ার ফলে আরও 2,000 চাকরি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

কয়লা যুগ উন্নত বিশ্বে অস্তগামী হলেও বিশ্বের দুটি সর্বাধিক জনবহুল দেশ চিন এবং ভারতে এখনও কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রবল ভাবে বর্তমান, যেখানে শক্তির চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই দুটি দেশ বিশ্বের সিংহভাগ কয়লা ব্যবহার করে, এবং কয়লার জন্য তাদের চাহিদা 2023 সালে বিশ্বব্যাপী কয়লার ব্যবহার রেকর্ড মাত্রায়, অর্থাৎ প্রায় 8.5 বিলিয়ন মেট্রিক টনে পৌঁছে গেছে।

ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি আশা করছে যে, চিনের কয়লা ব্যবহার 2024 সালে সর্বোচ্চ হতে পারে এবং আগামী কয়েক বছরে স্থিতিশীল হওয়ার সম্ভাবনা। সংস্থাটির অনুমান চীনে বায়ু এবং সৌর শক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার কয়লার চাহিদা কমিয়ে আনবে। ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় 70 শতাংশ কয়লা ভিত্তিক। তবে ভবিষ্যতে এই পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

সাহায্যসূত্র

1. *Britain Shuts Down Last Coal Plant, 'Turning Its Back on Coal Forever': By Somini Sengupta. NY Times. Sept. 30, 2024.*
2. *Coal Mining in the British Industrial Revolution: By Mark Cartwright. World History Encyclopedia, published on 17 March 2023.*
3. *Ministry of Power, Govt. Of India.*
4. *BBC News*
5. *International Energy Agency (IEA) website.*

*লেখক **শ্রী মানস রায়** একজন প্রকৌশলী এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চার দশক বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত। ইমেল: manaskray@gmail.com*

চলে গেলেন অগ্রণী কৃষি-বাস্তুবিদ অধ্যাপক পার্থিব বসু

অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি না ফেরার দেশে চলে গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড: পার্থিব বসু (20.05.1963–04.11.2024)। পার্থিব বসুর গবেষণা ও কর্মজগতের পরিধিকে এক কথায় ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। বাস্তুতন্ত্রের উপর, বিশেষত পরাগায়ন ও কৃষি পরিবেশবিদ্যা নিয়ে তাঁর মৌলিক ও অগ্রণী গবেষণা তাঁকে পরিচিতি দিয়েছে দেশে ও বিদেশে।

মাত্র 61 বছর বয়সে তাঁর এই অকাল প্রয়াণ শুধুই যে একজন প্রিয় অধ্যাপকের প্রস্থান, এমনটা নয়, বরং সেটি বিজ্ঞান ও সমাজের সমৃদ্ধ হওয়ার একটি বৃহত্তর সম্ভাবনার পথকে বন্ধুর করলো।

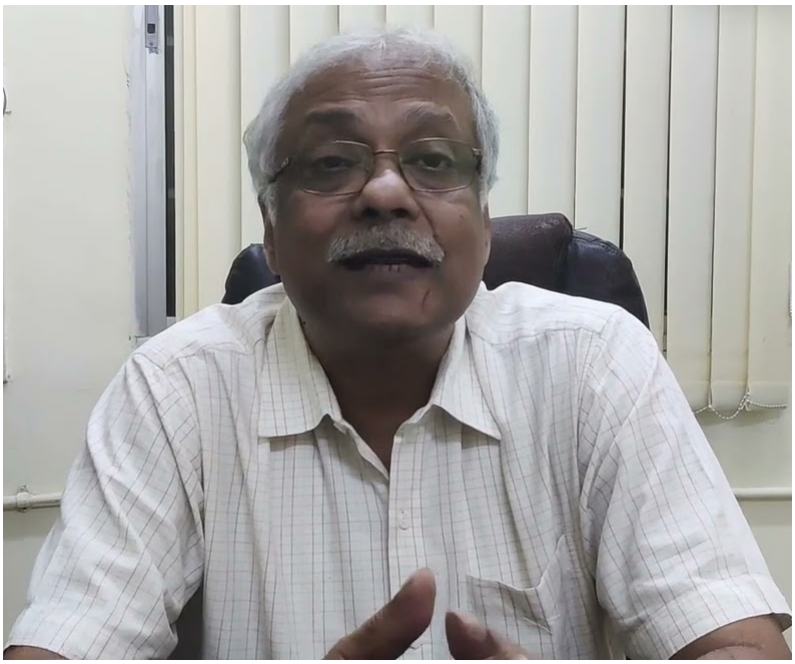

অধ্যাপক বসুর মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা কলকাতার অনতিদূরে বনগাঁয়। তারপর চলে আসেন কলকাতায়। 1980 সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। ইছামতির ধারে বিভূতিভূষণের বনগাঁয় বড় হওয়ার সময়ই তাঁর অন্তরে এক সৃষ্টিশীল মননের বীজ প্রোথিত হয়েছিল। কলকাতায় শুরুর দিনগুলোয় স্কটিশ ও বিদ্যাসাগর কলেজে প্রাণীবিদ্যার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে বৌদ্ধিক চর্চার হাতেখড়ি হয় তাঁর। নিয়মিত সাহিত্যচর্চা, সিনেমা দেখা, দেশ-বিদেশের সমসাময়িক ঘটনাবলীর খবর রাখা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়। সমাজচেতনা, সামাজিক ঘটনাবলীর অনুপম বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা, তার প্রয়োগ—1984 থেকে 86 সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগে স্নাতকোত্তর পর্বের সময়কালে তাঁর জীবনে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন। এই সময়ে তিনি যেমন নিজ বিষয়ে দক্ষতা বাড়িয়েছেন, তেমনই পরিচিত হয়েছেন বহু বিখ্যাত, সমকালীন, সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে। নানা ধরনের আলোচনাচক্রে অংশগ্রহনের মাধ্যমে আলোকিত হয়েছেন বিজ্ঞানের নতুন এবং বহুমুখী আধুনিক ধারায়। তৎকালীন কলকাতার বহু অগ্রণী বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পান তিনি। নানা বিষয়ে তাঁর উৎসাহ বাড়তে থাকে, বিশেষত বাস্তুতন্ত্রবিদ্যা এবং পরিবেশ বিজ্ঞান এর নানান ধারা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে নতুন ভাবে ভাবতে। সমসাময়িক কিছু ঘটনা, যেমন ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়, চেরনোবিলের পরমাণু বিপর্যয়, বা গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের সূচনা এবং নয়া পরিবেশ আইনের 1986 সালের প্রস্তাবনা তাঁর কাজে নতুন উৎসাহ সঞ্চার করে। এসব ঘটনা ছিল তাঁর কাছে সমমনস্ক সহপাঠীদের সঙ্গে বেড়ে ওঠার নতুন নতুন উপাদান।

পরবর্তী পর্বে ইউজিসি নেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি চলে যান পন্ডিচেরি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে “সেন্টার ফর ইকোলজি”তে তিনি গবেষণার বিষয় হিসাবে পিঁপড়ে এবং তাদের ব্যবহার ও বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে উৎসাহী হন। ডঃ প্রিয়া দাবীদার তাঁর গাইড হিসাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন নতুন চোখে কোন একটি গবেষণার বিষয়কে দেখতে, সেটিকে বিশ্লেষণ করতে, সিদ্ধান্তে পৌঁছতে। কাজের সূত্রে এই সময়কালে গবেষক পার্থিব বসু পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং নীলগিরিতে বহুবার যান এবং সেখানে থেকে দীর্ঘদিন কাজ করেন। তিনি পন্ডিচেরি সায়েন্স ফোরামের সাথেও যুক্ত হন এবং পন্ডিচেরি, তামিলনাড়ু সহ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় জনবিজ্ঞান আন্দোলনের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। শিশুদের মধ্যে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে এই পর্যায়ে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন।

1994 থেকে 1996 ইন্সটিটিউট ফ্রান্সিস ডি পন্ডিচেরী-তে তিনি পোস্ট ডক্টরাল গবেষণার কাজ করেন। 1997 সালের নভেম্বর মাসে তিনি কলকাতার আশুতোষ কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং অনতিবিলম্বেই একজন জনপ্রিয়

শিক্ষক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শিক্ষামূলক ভ্রমণে নানা ধরনের বাস্তুতন্ত্র বিষয়ক শিক্ষার প্রয়োগের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখেন। 1998 সালে ভারত সরকারের বয়কাস্ট ফেলোশিপ নিয়ে তিনি ফ্রান্সের প্যারিসে পোস্ট ডক্টরালের কাজে যুক্ত থাকেন। 2005-06 সাল নাগাদ এক বছর আসামের শিলচরে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত থাকার পর তিনি পুনরায় আশুতোষ কলেজে ফিরে আসেন।

পরবর্তী পর্যায়ে 2009 এর জানুয়ারি মাসে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগে যোগদান করেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ইকোলজি রিসার্চ ইউনিটে গবেষণায় যুক্ত হন। এখানে তিনি বাস্তুতন্ত্রবিদ্যা নিয়ে তাঁর গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যান এবং পরাগায়ন নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। এই সময় থেকেই বহু ছাত্রছাত্রী তাঁর তত্ত্বাবধানে পিএইচডি তে যোগদান করেন। শুধু তাই নয়, একই সময়ে তিনি কৃষি-পরিবেশবিদ্যায় ও উল্লেখযোগ্য গবেষণা চর্চার স্বাক্ষর রাখেন। ফলিত কৃষি পরিবেশবিদ্যার অংশ হিসাবে কৃষকদের জন্য বিশেষ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেন। যাঁরা গ্রামে জৈব চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করছেন, তাঁদের উপস্থিতিতে তাঁদের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরেন। এটি নিশ্চিতভাবেই একটি অভিনব প্রয়াস। সর্বোপরি মৌমাছি বিষয়ক মৌলিক গবেষণা—মৌমাছিদের উপর কীটনাশকের প্রভাব নিয়ে গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল, এবং উড়িষ্যা, ত্রিপুরায় এই গবেষণার বিস্তারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কীটনাশকের প্রভাবে মৌমাছি সহ অন্যান্য পোকামাকড়ের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন পরাগমিলন প্রক্রিয়াকে কীভাবে প্রভাবিত করছে তা বোঝার জন্য তিনি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় গবেষকদের নিয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন।

পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেও আমরা তাঁর এই ধরনের গবেষণার সাক্ষী। আমরা জানি মৌমাছি একটি অতি উল্লেখযোগ্য পতঙ্গ, পরিবেশ রক্ষায় যার পরাগায়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নানাবিধ ভূমিকা রয়েছে। অতএব যখন মৌমাছিদের ব্যবহার বদলে যায়, বা সংখ্যা কমে আসে, তখন স্বভাবতই আমাদের চিন্তিত হতে হয়। এই বিষয়ে অধ্যাপক বসুর মৌলিক গবেষণা ও তার ফলাফল আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধীনে তিনি "সেন্টার ফর এগ্রোইকোলজি এন্ড পলিন্যাশন স্টাডিজ" প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা ছিলেন। বিভিন্ন ভূ-জলবায়ু এলাকায় বাস্তুতন্ত্রের অবস্থান যাচাই ও তাদের উপরে পরিবেশের প্রভাবে জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে কী ধরণের ব্যাঘাত ঘটছে, তার উপরে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ করেন। পাখি, পতঙ্গ ও বিভিন্ন পোকামাকড়ের উপরে কীটনাশক ও অন্যান্য দূষকের কী ধরণের প্রভাব এবং তার জন্য মানুষ সহ সার্বিক বাস্তুতন্ত্র কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তা নিয়ে তাঁর কাজ সমাজে এক গুরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

কীটনাশক জনিত দূষণের থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য জৈবচাষের প্রচলনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি। 2012 সাল থেকে কৃষি-বাস্তুতন্ত্রের উপরে কাজ শুরু করেন। তিনি আন্তর্জাতিক প্রকল্প "ডারউইন ইনিশিয়েটিভ প্রকল্প" – এর সাথে যুক্ত হন এবং "ডারউইন ফেলো" হিসাবে নির্বাচিত হন। তাৎক্ষণিক যেকোনো প্রযুক্তির অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করে প্রয়োগের বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি।

তিনি ব্রিটিশ ইকোলজিক্যাল সোসাইটিরও সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণা দেশে-বিদেশে নানা অগ্রণী বিজ্ঞান-পত্রিকায় প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়। প্রচুর ছাত্রছাত্রী এবং গবেষক তাঁর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক স্তরে পরস্পরের পরিচিত হন। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থার "পলিন্যাশন অ্যাকশন টীম" এর সদস্য ছিলেন। ঐ টিমের সদস্য হিসাবে সারা পৃথিবী জুড়ে পরাগমিলন যে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তা নিরসনে বৈজ্ঞানিক পন্থা নির্ধারনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। প্রচুর গবেষক ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন দেশে কৃষি-বাস্তুতন্ত্র ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কাজে যুক্ত করেছেন। 10 জনেরও বেশি ছাত্র ওনার তত্ত্বাবধানে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন এবং আরো আটজন ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক পার্থিব বসুর অধীনে পি এইচ ডি রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন। আরো কয়েকজন তাঁর অধীনে গবেষণার কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি ছিলেন প্রেরণার উৎস। দেশ বিদেশের জার্নালে তাঁর প্রায় চল্লিশটিরও বেশী গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। তিনি গবেষকদের নানান কাজে উৎসাহিত করতেন। গবেষণা ছাড়াও শিক্ষক হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আন্দোলনের অংশ হিসাবে তিনি সমানভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন বিভিন্ন সময়ে।

কলকাতায় অধ্যাপনার সময় বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার, কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ছিলেন। তিনি অল ইন্ডিয়া পিপল সাইন্স নেটওয়ার্কের সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষক-বিজ্ঞানীদের জনবিজ্ঞান আন্দোলনের আঙিনায় যুক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সদা প্রয়াসী। গবেষণার সুফলকে ল্যাবরেটরির বাইরে নিয়ে এসে তার ব্যবহারিক প্রয়োগে অধ্যাপক বসুর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তিনি জৈব চাষ পদ্ধতিকে জনবিজ্ঞান আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে চাষীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষার অধিকার ও শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে তিনি ছিলেন সামনের সারিতে। সম্মিলিতভাবে সকলের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসার ও তাঁর কাজের ধারা বয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই একমাত্র আমরা আমাদের সবার প্রিয় অধ্যাপক, বন্ধু, ড. পার্থিব বসুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারি।

অধ্যাপক বসু মরণোত্তর দেহদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। সেইমতো তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দেহ তুলে দেওয়া হয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে। অধ্যাপক পার্থিব বসু তাঁর গবেষণা ও কাজের মধ্যে দিয়েই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ●

তথ্য সূত্র ও ঋণ স্বীকার: সম্পৃক্তা বোস, গবেষক

লেখক ***ডঃ অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়*** *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক।*
ইমেল: amcu.envs24@gmail.com

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের ডিসেম্বর মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা

ম্যানহাটান প্রকল্পের প্রথম পরীক্ষা

1942 সালের 2রা ডিসেম্বর তারিখে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানহাটন প্রকল্পে কাজ করা বিজ্ঞানীরা ইতিহাসে প্রথম নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক শৃঙ্খল বিক্রিয়ার পরীক্ষা করেন। পরীক্ষাটি শিকাগো পাইল-1 (সিপি-1) নামে একটি চুল্লিতে স্ট্যাগ ফিল্ডের স্ট্যান্ডের নীচে একটি পুরানো স্কোয়াশ কোর্টে হয়েছিল। পারমাণবিক শক্তি এবং পারমাণবিক অস্ত্র উভয়ই তৈরি করতে পারমাণবিক বিভাজন ব্যবহার করা যেতে পারে তা প্রমাণের দিকে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। চুল্লিটি এনরিকো ফার্মি, আর্থার হলি কম্পটন এবং লিও সিলার্ড সহ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের একটি দল দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এটি একটি 20-ফুট লম্বা কাঠামো ছিল যা গ্রাফাইট ব্লকের মাঝে রাখা ইউরেনিয়াম থেকে তৈরি হয়েছিল। চুল্লির উদ্দেশ্য ছিল একটি চেইন প্রতিক্রিয়া শুরু করা এবং বজায় রাখা, যেখানে ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভক্ত হয়ে নিউট্রন নিঃসরণ করবে এবং এই নিঃসৃত নিউট্রন পরবর্তী স্তরের ইউরেনিয়াম পরমাণুগুলিকে বিভক্ত করবে। যতক্ষণ চুল্লিতে ইউরেনিয়াম থাকবে, এই বিভাজন প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে। পরীক্ষাটি ধীরে ধীরে এবং সাবধানে পরিচালিত হয়েছিল, প্রতিক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য নিয়ন্ত্রণ রড ঢোকানো হয়েছিল। বিকাল 3:53-এ, একটি স্ব-টেকসই চেইন প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করা হয়েছিল। 28 মিনিট স্থায়ী এই পরীক্ষাটি পারমাণবিক যুগের সূচনাকে চিহ্নিত করেছিল। এই সাফল্য কেবলমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত পারমাণবিক অস্ত্রের বিকাশে অবদান রাখে না, তবে ভবিষ্যতের পারমাণবিক শক্তি প্রযুক্তির পথও প্রশস্ত করেছে।

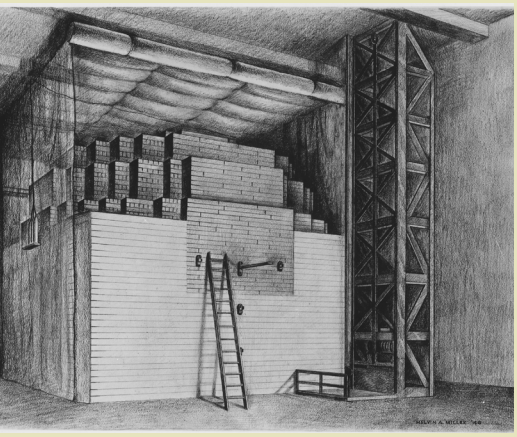

লন্ডনের বিখ্যাত ধোঁয়াশা

1952 সালের 5 ডিসেম্বর থেকে 9 ডিসেম্বর পর্যন্ত সমগ্র লন্ডন শহর গাঢ় ধোঁয়াশায় আবৃত ছিল এবং এটি ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক বায়ু দূষণের ঘটনাগুলির মধ্যে একটি। অস্বাভাবিকভাবে ঠাণ্ডা আবহাওয়া, ঘূর্ণিঝড় এবং বায়ুবিহীন অবস্থার সংমিশ্রণে শহরের উপর প্রাথমিকভাবে পোড়া কয়লা থেকে উৎপন্ন দূষণ পদার্থ বায়ুতে আটকা পড়ে। এর ফলে সৃষ্ট ধোঁয়াশা আগের ঘটে যাওয়া এই ধরণের সব ঘটনার থেকে অনেক বেশি মারাত্মক রূপ নেয়, দৃশ্যমানতা শূন্যের কাছাকাছি কমে আসে এবং এই দূষণ বাসস্থানের মধ্যেও প্রবেশ করে। প্রাথমিক সরকারী অনুমান অনুসারে ওই সময় 4,000 পর্যন্ত মানুষ সরাসরি ধোঁয়াশায় মারা যায় এবং 100,000 জন অসুস্থ হয়ে পড়ে। যদিও পরবর্তী গবেষণায় দেখা যায় প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা 10,000 থেকে 12,000 এর মধ্যেও হতে পারে। 13শ শতাব্দী থেকে বায়ু দূষণ লন্ডনে একটি স্থায়ী সমস্যা ছিল, ডায়েরিস্ট জন ইভলিন 1661 সালে এটি সম্পর্কে লিখেছিলেন। গ্রেট স্মগের তীব্রতা স্বাস্থ্যের উপর বায়ুর গুণমানের প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিল। এটি সেই সময়ে যুক্তরাজ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত বিপর্যয় হয়ে ওঠে, যার ফলে নীতি ও প্রবিধানে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়। প্রতিক্রিয়া হিসাবে, 1956 সালের ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল ধোঁয়া নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা এবং শহরে বায়ুর গুণমান উন্নত করা। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণ নীতির স্বপক্ষে এটাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের উদ্ভাবন

1900 সালের 14ই ডিসেম্বর জার্মান পদার্থবিদ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক "ব্ল্যাকবডি" পদার্থের উপর বিকিরণের প্রভাব সম্পর্কে তার যুগান্তকারী গবেষণা প্রকাশ করেন এবং তার এই গবেষণা থেকেই আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের কোয়ান্টাম তত্ত্বের জন্ম হয়। ভৌতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্ল্যাঙ্ক দেখিয়েছিলেন যে শক্তি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ভৌতিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করতে পারে। ধ্রুপদী পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুসারে শক্তি শুধুমাত্র একটি অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ-সদৃশ ঘটনা, যা ভৌত পদার্থের বৈশিষ্ট্য থেকে স্বাধীন। প্ল্যাঙ্কের তত্ত্ব ছিল যে দীপ্তিমান শক্তি কণার মতো উপাদান দিয়ে গঠিত, যা "কোয়ান্টা" নামে পরিচিত। তত্ত্বটি পূর্বে অব্যক্ত প্রাকৃতিক ঘটনা যেমন কঠিন পদার্থে তাপের আচরণ এবং পারমাণবিক স্তরে আলো শোষণের প্রকৃতি জাতীয় পদার্থবিজ্ঞানের বহু রহস্য সমাধান করতে সাহায্য করেছিল। 1918 সালে প্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাকবডি বিকিরণ নিয়ে তার কাজের জন্য পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

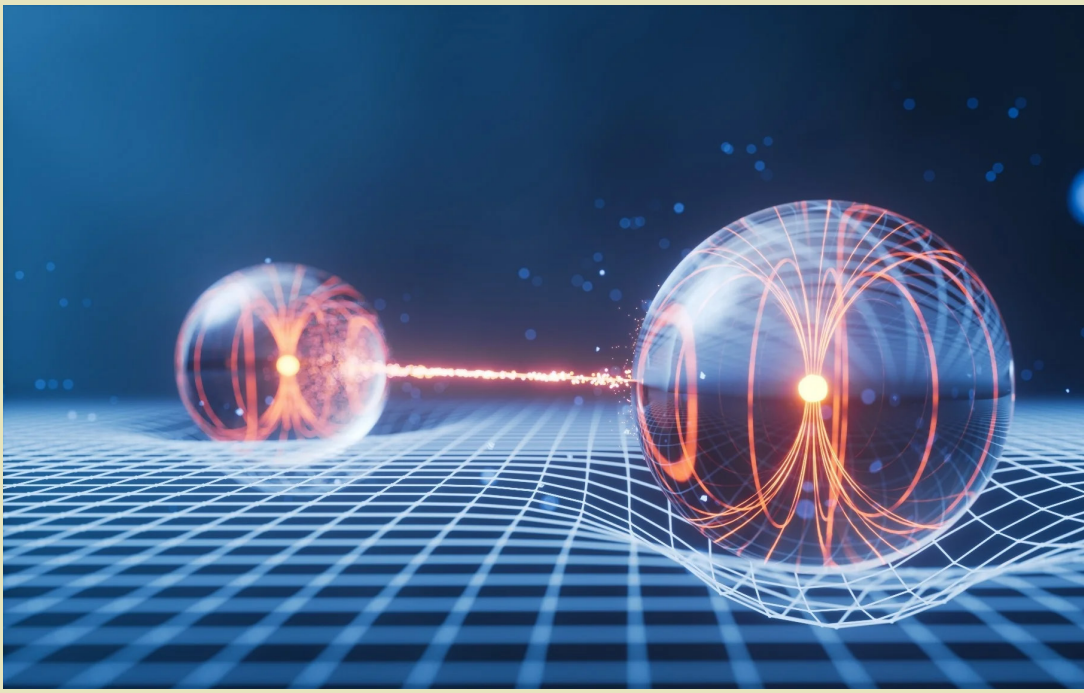

অন্যান্য বিজ্ঞানী, যেমন আলবার্ট আইনস্টাইন, নিলস বোর, লুই ডি ব্রগলি, এরউইন শ্রোডিঙ্গার এবং পল এম ডিরাক প্লাঙ্কের তত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিকাশকে বাস্তবায়িত করেন। কোয়ান্টাম তত্ত্বের গাণিতিক প্রয়োগ সিদ্ধ করে যে পদার্থ এবং শক্তি উভয়ই মূলত তরঙ্গধর্মী যা নির্দিষ্ট ভেরিয়েবলের উপর নির্ভর করে। সনাতনী বলবিদ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত তত্ত্ব এই কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রকৃতিতে ঘটে চলা নানা ঘটনার জন্য সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদান করে যেখানে বস্তুর সমস্ত সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নীতিগতভাবে গণনাযোগ্য। বর্তমানে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের সাথে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সমন্বয় আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি।

এন্ড্রোমিডা ছায়াপথের আবিষ্কার

1924 সালের 30শে ডিসেম্বর জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছিলেন যা মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণার আমূল ঘটিয়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরিতে শক্তিশালী 100-ইঞ্চি টেলিস্কোপ ব্যবহার করে হাবল সর্পিল নীহারিকা অ্যান্ড্রোমিডা পর্যবেক্ষণ করেন, যা আগে মিল্কিওয়ের মধ্যে গ্যাস বা ধূলিকণার মেঘ বলে মনে করা হতো। তিনি অ্যান্ড্রোমিডায় এমন পরিবর্তনশীল নক্ষত্র খুঁজে পান যেগুলির উজ্জ্বলতা নিয়মিত প্যাটার্নে ওঠানামা করে। 1912 সালে হেনরিয়েটা লেভিট আবিষ্কার করেছিলেন যে এই তারার ওঠানামার সময়কাল পরিমাপ করে, তারার দূরত্ব গণনা করা যেতে পারে। লেভিটের পদ্ধতি প্রয়োগ করে হাবল নির্ধারণ করেছিলেন যে অ্যান্ড্রোমিডা প্রায় 860,000 আলোকবর্ষ দূরে, যা মিল্কিওয়ের প্রান্তের বাইরে। এই আবিষ্কারটি প্রমাণ করে যে অ্যান্ড্রোমিডা আমাদের গ্যালাক্সির অংশ নয়, একটি সম্পূর্ণ আলাদা গ্যালাক্সি যা মহাজাগতিক পরিসর সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করেছে। এর আগে মানুষ বিশ্বাস করতো যে মিল্কিওয়েতে সমস্ত বা বেশিরভাগ তারা রয়েছে। হাবলের কাজ চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেছে যে আমাদের গ্যালাক্সি বিশাল মহাবিশ্বের একমাত্র গ্যালাক্সি নয়, অগণিত গ্যালাক্সি মধ্যে একটি।

ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা

শ্রীনিবাস রামানুজন

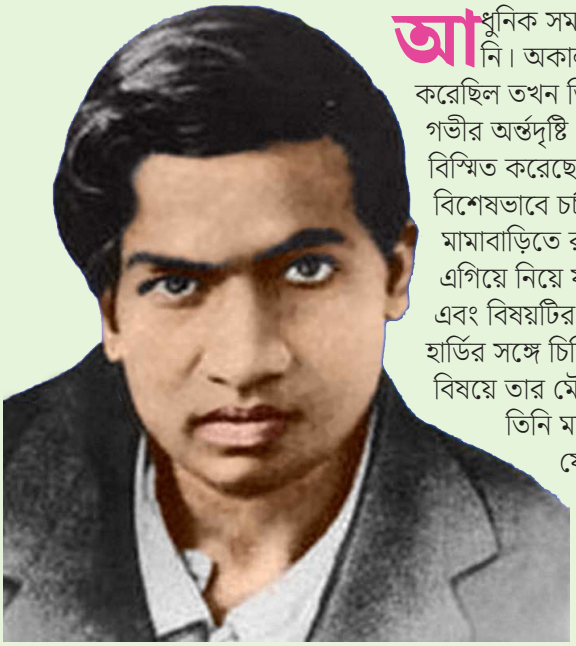

আধুনিক সময়ে রামানুজনের মত বড় মাপের গণিতজ্ঞ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নি। অকালপ্রয়াত এই গণিতজ্ঞের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি যখন সবে আসতে শুরু করেছিল তখন তিনি মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে প্রয়াত হন। গণিতে তার অবদান এবং তার গভীর অর্ন্তদৃষ্টি এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক গণিত মহলকে বিস্মিত করেছে, অন্যদিকে তার স্বল্পস্থায়ী জীবনে রেখে যাওয়া গাণিতিক অবদান এখনও বিশেষভাবে চর্চা হয়ে চলেছে। 1887 সালের 22শে ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর এরোডে তার মামাবাড়িতে রামানুজনের জন্ম হয়। প্রবল দারিদ্র এবং দূর্বল স্বাস্থ্য তার প্রথাগত পড়াশুনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয় নি। তবু গণিতের প্রতি তার তীব্র আকর্ষণ এবং বিষয়টির চর্চা তিনি প্রতিকূলতার মধ্যে চালিয়ে গেছেন। ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ জি এইচ হার্ডির সঙ্গে চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে যোগাযোগ হয় এবং তিনি ইংল্যান্ডে পা রাখেন। গণিত বিষয়ে তার মৌলিক চিন্তা বিদেশী গণিতবিদদের সমীহ আদায় করে নেয়। 1918 সালে তিনি মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। তার মৃত্যুর পরে তার অনেকগুলি গাণিতিক কাজ আবিষ্কৃত হয়, যার মধ্যে দিয়ে রামানুজনের জ্ঞানের ব্যাপ্তি আরও বেশি করে সর্বসমক্ষে আসে। আমাদের দেশে 2012 সাল থেকে রামানুজনের জন্মদিন 22শে ডিসেম্বর জাতীয় গণিত দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

জোসেফ লুই গে লুসাক

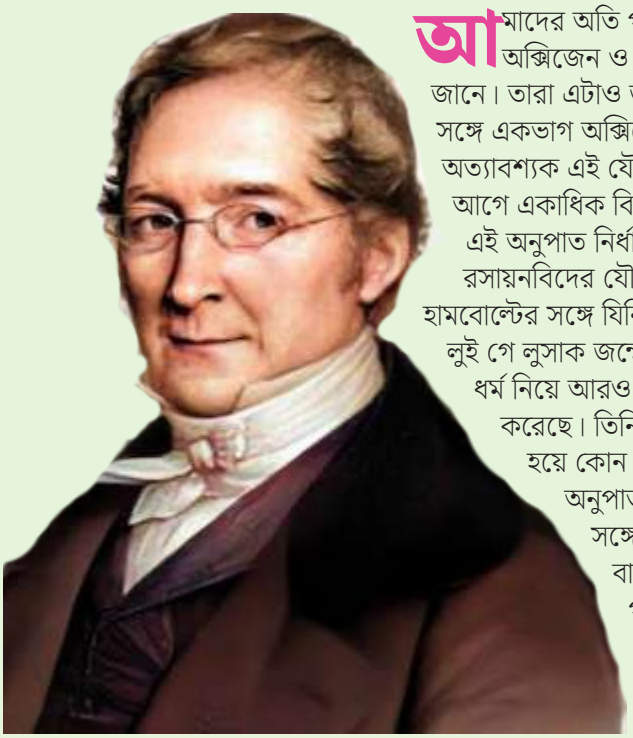

আমাদের অতি পরিচিত তরল জল যে একটি যৌগ এবং তা যে দুটি মৌল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত সেটা এখন খুব ছোটরাও জানে। তারা এটাও জানে যে আয়তনের হিসেবে একভাগ দু ভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে একভাগ অক্সিজেন যুক্ত হয়ে গঠিত হয় আমাদের জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক এই যৌগটি। জল যে, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের একটি যৌগ তা আগে একাধিক বিজ্ঞানী চিহ্নিত করলেও জলে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের এই অনুপাত নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ছিল এক ফরাসী ও এক জার্মান রসায়নবিদের যৌথ প্রয়াসের ফল। জার্মান বিজ্ঞানী আলেক্সান্ডার ভন হামবোল্টের সঙ্গে যিনি এই কাজটি করেছিলেন সেই ফরাসি বিজ্ঞানী জোসেফ লুই গে লুসাক জন্মেছিলেন 1778 সালের 6ই ডিসেম্বর। গে লুসাক গ্যাসের ধর্ম নিয়ে আরও কিছু কাজ করেছেন যা রসায়নের মৌলিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। তিনি প্রথম দেখান যে যখন দুই বা ততোধিক গ্যাস রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে কোন যৌগ তৈরি করে তখন সেই গ্যাসগুলির আয়তনের মধ্যে একটি সরল অনুপাত লক্ষ করা যায়। আর এক ফরাসী বিজ্ঞানী জাঁ ব্যাপিস্তে বায়ো র সঙ্গে তিনি বেলুনে চড়ে কুড়িহাজার ফুটেরও বেশি উচ্চতায় আরোহণ করে বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন উচ্চতার বাতাস সংগ্রহ করে দেখিয়েছিলেন যে বায়ুর গঠন সব উচ্চতাতেই অভিন্ন থাকে। এই কাজে যে বিপুল ঝুঁকি ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মৌলিক পদার্থ বোরনের তিনি অন্যতম আবিষ্কারক।

আর্নল্ড সমারফেল্ড

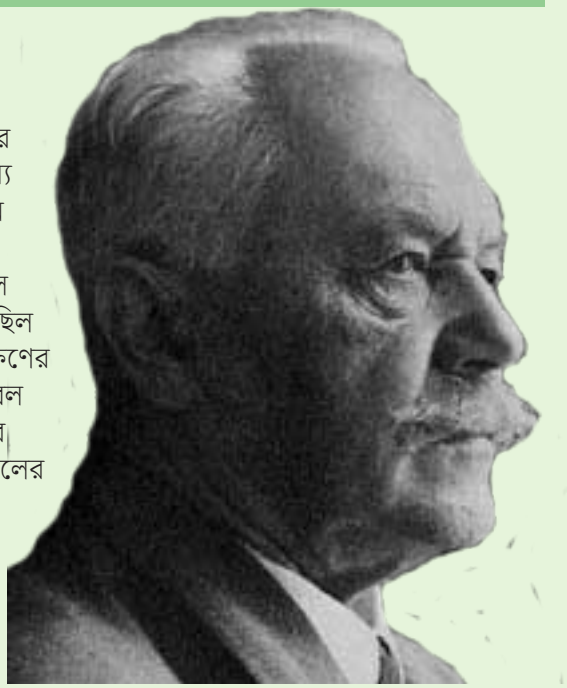

উনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জার্মান পদার্থবিদেরা যে সব যুগান্তকারী অবদান রেখেছেন, এবং পদার্থবিদ্যাকে আধুনিক রূপ দেওয়ায় যাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল তাদের অন্যতম হচ্ছেন আর্নল্ড সমারফেল্ড। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ শিক্ষক। যে কোন গবেষণার কাজে কোন সমস্যা থাকলে জার্মান বিজ্ঞানীরা তো বটেই, ইওরোপের অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা যার সঙ্গে নির্দ্বিধায় আলোচনা করতে পারতেন তিনি হচ্ছেন সমারফেল্ড। তাই সমারফেল্ডের কৃতী ছাত্রের তালিকাটি অসাধারণ বললেও কম বলা হয়। তার একাধিক ছাত্র নোবেল জয় করেছেন। 1913 সালে নীলস বোর হাইড্রোজেন পরমাণুর যে মডেল উপস্থপনা করেন তা একদিকে যেমন ছিল বৈপ্লবিক এবং অন্যদিকে সেই মডেল পরমাণু বিষয়ক বহু অব্যাখ্যাত পর্যবেক্ষণের যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়। বোর তার কাজের জন্য 1922 সালের নোবেল পুরস্কার জয় করেন। কিন্তু সমারফেল্ড সেই মডেলকে আরও উন্নত করে তার প্রয়োগের ক্ষেত্র বিস্তৃত করেন। বিভিন্ন সময়ে সমারফেল্ড পদার্থবিদ্যার নোবেলের জন্য আশিটির থেকেও বেশি মনোনয়ন পেলেও এই পুরস্কারে তিনি বঞ্চিত থেকে গেছেন। আর্নল্ড সমারফেল্ড 1868 সালে 5ই ডিসেম্বর জার্মানির কনিসবার্গ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সাম্মানিক ডিএস সি উপাধিতে ভূষিত করে 1928 সালে। সমারফেল্ড সেই সম্মান গ্রহণ করতে সেই সময় কোলকাতায় আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পদার্থবিদ্যা বিষয়ক ছ'টি ভাষণ দেন। ●

স্যার হামফ্রে ডেভি

ইংল্যান্ডে অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে 1778 সালের 17ই ডিসেম্বর স্যার হামফ্রে ডেভি জন্মগ্রহণ করেন। একেবারে তরুণ বয়সে তিনি নানা বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন; কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই তার মূল আকর্ষণের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে রসায়ন ও সদ্য আবিষ্কৃত চল-তড়িৎ। তিনি বুঝতে পারেন যে চল-তড়িৎ ব্যবহার করে রসায়নের নতুন দিশার সন্ধান করা যায়। তিনি তড়িৎ-বিশ্লেষণের সাহায্যে কিছু বিশেষ যৌগ থেকে নতুন রাসায়নিক মৌলের সন্ধানে উদ্যোগী হন। এই রাস্তায় তিনি কস্টিক পটাশ থেকে পটাসিয়াম এবং কস্টিক সোডা থেকে সোডিয়াম ধাতুকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হন। এই দুটি ধাতুর আবিষ্কর্তা হিসেবে স্বীকৃত হন ডেভি। তবে তিনি এখানেই থেমে থাকেন নি। মোটামুটি একই সময়ে তিনি ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামকেও তাদের যৌগ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হন। বেরিয়াম ও স্ট্রনসিয়াম আবিষ্কারেও মুখ্যভূমিকা রয়েছে ডেভির। তাছাড়া উনবিংশ শতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সমস্যার তিনি সমাধান করেছিলেন ডেভির সেফটি ল্যাম্প উদ্ভাবনার মধ্যে দিয়ে। এই ল্যাম্পের সাহায্যে খনিতে বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতি নির্ণয় করে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়, খনি শ্রমিকেরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। এই বিরাট অবদান সত্ত্বেও ডেভি নিজে কিন্তু মনে করতেন তার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার মাইকেল ফ্যারাডে। কারণ প্রথাগত শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা ফ্যারাডেকে ডেভি চিহ্নিত করেন তার রসায়নে বিশেষ আগ্রহের জন্য এবং তার গবেষণাগারে ফ্যারাডেকে সহকারী হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেন। পরবর্তীকালে ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক অবদান আজ ইতিহাস স্বীকৃত। ●

গ্রন্থ সমালোচনা

সংখ্যার গল্প

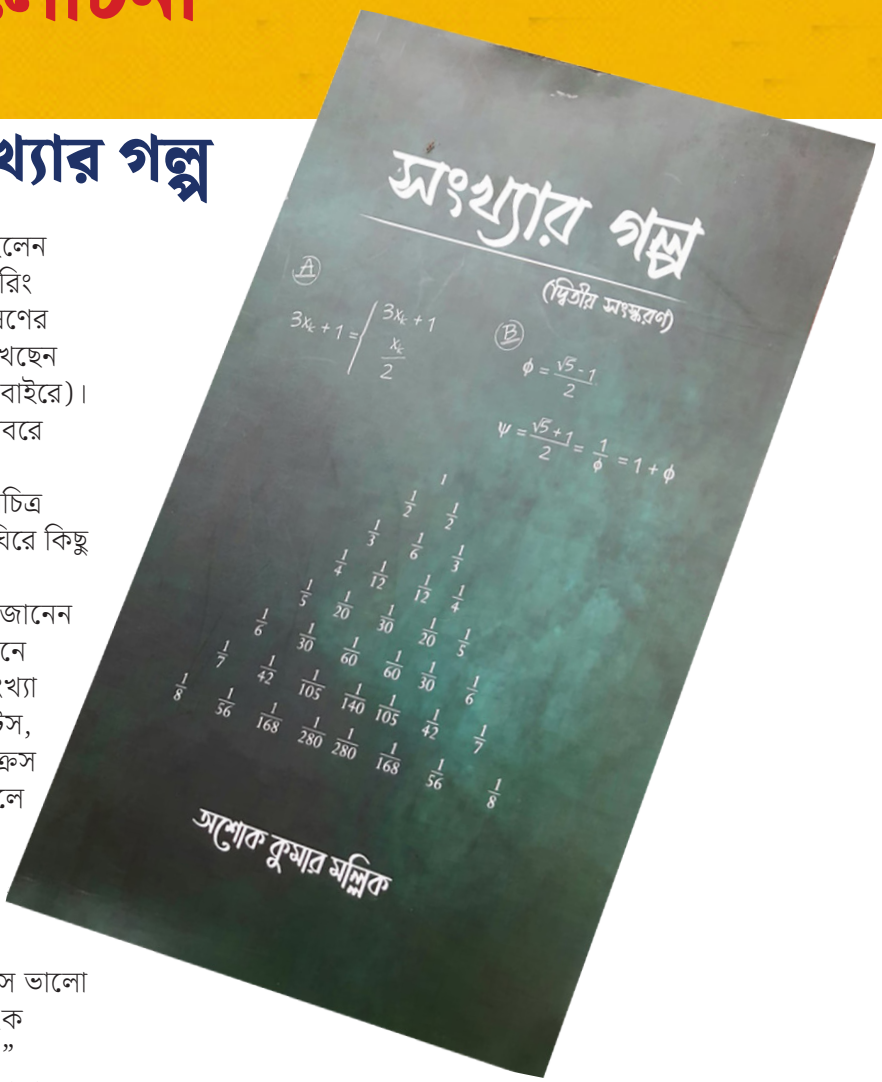

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অশোক কুমার মল্লিক ছিলেন আইআইটি কানপুরের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। অবসর সময়ে তাঁর নেশা ছিল গণিত অন্বেষণের নানা পরিসরে ঘোরাঘুরি। ইতিপূর্বে বাংলায় তিনি লিখেছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ "জ্যামিতি" (স্কুল গন্ডির একটু বাইরে)। এবারের বইটি সংখ্যা জগতের নানা বিষয়ের খোঁজখবরে বিস্তৃত পদচারণা। বইটিতে রয়েছে নানা রকম সংখ্যা আবিষ্কার, তাদের মধ্যে চমকপ্রদ প্যাটার্ন, সংখ্যার বিচিত্র রহস্যময়তা ঘিরে। আছে বিশ্ব বিখ্যাত গণিতজ্ঞদের ঘিরে কিছু মজার গল্প।

গণিতের সঙ্গে যারা সামান্যভাবেও যুক্ত, তারা জানেন সংখ্যার রহস্যময় তা অনন্ত বিস্তারে পরিব্যপ্ত। এখানে মৌলিক সংখ্যা (Prime Number), যৌগিক সংখ্যা (Composite Number), পিথাগোরিয়ান ট্রিপ্লেটস, মুলদ রাশি, অমূলদ রাশি, স্বর্ণ সংখ্যা (ফিবোনাচ্চি ক্রস বা সিকোয়েন্স) এমন বহু বিষয়ে খুব সহজ করে তুলে ধরা হয়েছে। লেখকের বহু পরিশ্রম ও যত্নে এই বইটি একটি উজ্জ্বল পরিবেশন বলে মনে করি। লেখক ভূমিকা অংশে বলেছেন, "কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে 'করি' শব্দটি ব্যবহার করি না। আমরা বলে থাকি, মাংস কষি আর অংক কষি। অর্থাৎ এই দুটো জিনিস ভালো করে না কষলে ভালো হয় না। এই বইতে কোন অংক কষতে দেওয়া হয়নি। তাই অংক শেখানো হবে না।"

আমার নিজের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, স্কুলে পড়ার সময় ক্লাস পাঠ্য বা পরীক্ষার জন্য 'ভয়ানক' স্কুলের গণিত বই ছিল একমাত্র ভাবনার বিষয়। স্কুল থেকেই যে বিচিত্র গণিত ভাবনায় ছাত্র-ছাত্রীদের আবিষ্ট করা জরুরী, সে চিন্তা বোধহয় আজও গড়ে ওঠেনি। অভিভাবক বা শিক্ষক-শিক্ষিকা সমাজ ও যথেষ্ট সচেতন নন। এই বইটি স্কুল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও আগ্রহের সঙ্গে উল্টাতে পারে। সক্ষমতা অনুযায়ী গ্রহণ করবে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইসব তত্ত্বের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হবে। গণিত প্রীতি গড়ে তোলায় এই ধরনের বই অত্যন্ত জরুরি।

বিখ্যাত গণিত প্রতিভা রামানুজনের কথা এই বইতে অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। বিশ্বখ্যাত প্রায় সব গণিত প্রতিভারাই হাজির দুই মলাটের বন্ধনে। গণিত ভুবনকে চিনতে জানতে এইরকম বই হাতের নাগালে থাকা একান্ত জরুরি বলেই মনে করি।

সংখ্যার গল্প
লেখকঃ অশোক কুমার মল্লিক
প্রকাশক: পশ্চিমবঙ্গ গণিত পরিষৎ
পৃষ্ঠা: 205 | মূল্য: 400.00

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ মুদ্রণের দিক থেকে বইটি যথেষ্ট উন্নত মানের। ভিতরে প্রাসঙ্গিক ছবির সমাহার বইটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ছাত্রছাত্রীদের চিরাচরিত গণিত ভীতি কাটিয়ে তাদেরকে গণিতমুখী করে তোলাই এই বইটি প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য।

দীপক কুমার দাঁ
গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ
9064757684

লেখকদের জন্য: বাংলা বিজ্ঞান কথায় অনধিক 1200 শব্দের মধ্যে বাংলায় লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ, বিজ্ঞানের গল্প, কল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে লেখা পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। হাতে লেখা বা ইউনিকোড ফন্টে টাইপ করা পাণ্ডুলিপি এবং পৃথকভাবে লেখা সংক্রান্ত ছবি পাঠানোর জন্য Bangla Bigyan Katha, Shanti Foundation, UG 17, Jyoti Shikhar, District Centre, Janakpuri, New Delhi 110060 ঠিকানায় চিঠি পাঠান বা ইমেল করুন: amitesh.shantifoundation@gmail.com. প্রতিটি লেখার শেষে অবশ্যই লেখক পরিচিতি ও লেখকের ইমেল উল্লেখ করুন।